ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বন্যা কবলিত এবং বন্যা পরবর্তী গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সুরক্ষায় কৃষক/খামারি ভাইদের জন্য করনীয়

- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে যথাসম্ভব উঁচু স্থানে ও শুকনো জায়গায় সম্ভব হলে মাচা বা বেড়া দিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ত্রিপল ব্যবহার করে অস্থায়ী তাঁবু বা শেড নির্মাণ করে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জরুরি পশুখাদ্য (যেমন: শুকনো খড়, বাঁশের পাতা, কলার পাতা, শেওড়া পাতা, গমের ভুষি, ডালের ভুষি ইত্যাদি) ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গবাদিপশু-পাখিকে বন্যার পানি খাওয়ানো যাবে না। প্রয়োজনে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি দ্বারা বিশুদ্ধ করে খাওয়াতে হবে।
- খড়সহ অন্যান্য পশু খাদ্য উঁচু স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যাকালীন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাসস্থানে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- মৃত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির যেকোনো পরামর্শ সেবার জন্য অধিদপ্তরের কল সেন্টারের ১৬৩৫৮ এ ফোন করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় টিকা প্রদান করতে হবে।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আকস্মিক বন্যায় মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের করণীয়

অস্বাভাবিক পানি প্রবাহ হঠাৎ করে বা আকস্মিকভাবে কোন এলাকায় আঘাত হানাকে আকস্মিক বন্যা বলে। আকস্মিক বন্যায় প্রাকৃতিক ও ভৌত-অবকাঠামোসহ মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

আকস্মিক বন্যার পূর্বে করণীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের চারিদিক বাঁশের বানা বা ঘন জাল দিয়ে ঘিরে দিন।
- এপ্রিল-অক্টোবর (চৈত্র-আশ্বিন) মাসে আকস্মিক বন্যার আগাম সতর্কতা পেতে সজাগ থাকুন। টিভি/রেডিওতে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শুনে বা ১০৯০ নম্বরে ফ্রি ফোন করে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা জানুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- পুকুরের/ জলাশয়ের অপেক্ষাকৃত বড় মাছগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা নিন।
- বন্যা কবলিত হতে পারে এমন পুকুরের প্রজননক্ষম মাছ ও ছোট মাছগুলিকে সতর্কতার সাথে পুকুরে নেটের তৈরি হাপা বা খাঁচা স্থাপন করে তাতে সংরক্ষণ করুন বা বন্যা-ঝুঁকিমুক্ত জলাশয়ে স্থানান্তর করুন।
- পাড়ে বেড়া দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জাল, মাছের খাবার, চুন, অক্সিজেন বৃদ্ধিকারক ও অন্যান্য অনুমোদিত মেডিসিন, প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুদ করে রাখুন।
- মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরার উপকরণ (জাল, নৌকা ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- নিকটস্থ মৎস্য অফিস ও অন্যান্য সেবা দানকারী সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।

আকস্মিক বন্যাকালীন করণীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের সুবিধাজনক স্থানে একাধিক জায়গায় ডাল-পালার ঝোপঝাড় দিয়ে মাছের আশ্রয়স্থল বা কাঠা বানিয়ে নিন যাতে মাছ সেখানে আশ্রয় নিতে পারে।
- মাছকে নিয়মিত দুইবেলা (সকালে সূর্য উঠার দুই ঘণ্টা পর এবং বিকাল ৩-৪ টার দিকে) খাদ্য দিতে হবে। দ্রুত আকৃষ্ট হয় এমন খাদ্য/খাদ্য উপকরণ (খৈল, চিটাগুড়, কেঁচো ইত্যাদি) জলাশয়ের নির্দিষ্ট দুই বা ততোধিক স্থানে দিতে হবে।
- একই এলাকায় বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া জলাশয়ের মালিকগণ সমাজ ভিত্তিক বা যৌথভাবে জাল বা বানা দিয়ে ঘেরাও করে মাছ চাষ ও রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে পারেন।
- বন্যা কবলিত পুকুরের মাছ খাবি খাচ্ছে এমন লক্ষণ দেখা দিলে এয়ারেটর স্থাপন/পাতিল দিয়ে পানিকে আন্দোলিত করে বা অক্সিজেন বর্ধক উপকরণ নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করে অক্সিজেন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বন্যা চলাকালীন জলাশয়ে প্রবল স্রোতের মধ্যে মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজেদের জান-মাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ সেবার জন্য অফিস চলাকালীন ১৬১২৬ হট লাইন নম্বরে ফোন করুন।

আকস্মিক বন্যা পরবর্তীকালে করণীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের পাড় ভেঙ্গে গেলে দ্রুত মেরামত করুন বা ভাংগা অংশে জাল/বানা দিয়ে ঘিরে ফেলুন।
- বন্যার পানির সাথে বাহির থেকে ভেসে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করলে তা ধরে ফেলুন।
- বন্যার পানি নেমে গেলে স্থানীয় মৎস্য অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী পুকুরে পরিমাণমত চুন এবং লবণ প্রয়োগ করুন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার নতুন করে মাছ চাষ শুরু করার পূর্বে স্থানীয় মৎস্য অফিসের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- পানিতে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হলে অর্থাৎ পানি সবুজাভ হলে ভাল জাতের বড় আকারের চাপের পোনা নির্দিষ্ট মজুদ ঘনত্ব অনুসারে মজুত করুন।
- জাল টেনে মাছের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়মিত ও পরিমিত সুষম মৎস্য খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের পানির গুণাগুণ ও মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।
- মাছ বড় হলে আংশিক আহরণ করে মজুদ ঘনত্ব ও পুকুরের ধারণ ক্ষমতা ঠিক রাখুন।
- বন্যাকবলিত এলাকায় পানি ৩-৪ মাস স্থায়ী হওয়ার সম্ভবনা থাকলে পেন বা খাঁচায় মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- মৎস্যজীবীগণ বন্যার পানি নেমে গেলে প্রয়োজনে জাল, নৌকা মেরামত করুন।
- বন্যাকবলিত পুকুরে মাছের রোগ-বালাই বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় মৎস্য অফিস ও অন্যান্য সেবা দানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখুন।

জনসচেতনতায়: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

১ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩২
এপ্রিল-জুন ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সার্বিক সহযোগিতায়
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা
ও
ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
সহকারী চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫-৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইলঃ
flidmofl@gmail.com
iol@gmail.com
iof@gmail.com

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় এবার (ঈদ-উল আযহা-২০২৫) সারাদেশে কোরবানিযোগ্য ১কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার ৩ শত ৩৩টি দেশীয় জাতের গবাদি পশু প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে কোরবানি করা হয়েছে ৯১ লাখেরও বেশি গবাদিপশু এবং উদ্বৃত আছে ৩৩ লাখ ১০ হাজার ৬০৩টি পশু। এটি দেশের জন্য ইতিবাচক খবর। কেননা বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ পশুতেই কোরবানির পশুর চাহিদা মেটানো যাচ্ছে। দেশের বাহির থেকে পশু আর আমদানি করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এতে দেশের খামারি ও উদ্যোক্তারা লাভবান হচ্ছে। পাশাপাশি দেশে একদিকে যেমন হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান। বিশেষকরে এই খাতের উপর নির্ভর করে নারীদের কর্মক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকার ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে; যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করছে। এছাড়াও এই খাতকে প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য সরকার দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করছে। পাশাপাশি দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও এই খাতে নিরাপদ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাগরে নতুন করে মাছ ধরার নিষিদ্ধকাল ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন এবং কাপ্তাই লেকে ৩০ এপ্রিল থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষকরে গবাদিপশু পালনে যে-সব নারী সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন তাদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার আওতায় আনার জন্য পৃথক প্রকল্প নেওয়ারও চিন্তা করছে সরকার। এই সংখ্যায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উদ্যোক্তাদের সফলতার গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন জনহিতকর খবর দেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নতুন নতুন উদ্যোক্তা এবং তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে দেশের আপামর জনসাধারণের উপকারে আসবে।

আশাকরি এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে। পাশাপাশি এ খাতকে সামনে আরও এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

০১	কোরবানির ঈদের জন্য পশু আমদানি করা হবে না : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৩
০২	গবেষণা করে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজাতির আইড় মাছের সন্ধান	০৪
০৩	৮ থেকে ১৪ এপ্রিল জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করবে সরকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৪-০৬
০৪	বেশি মাংস ও বেশি ডিম দেয় নতুন প্রজাতির 'বাউ-ডাক'	০৬-০৭
০৫	কাপ্তাইয়ে সাক্রাছড়ি জলাশয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	০৭
০৬	সামুদ্রিক মৎস্যখাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৮
০৭	দুগ্ধের অপার শক্তিতে, মেতে উঠি একসঙ্গে	০৯-১০
০৮	সফল খামারি রাশেদ-এর বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ টাকা	১০
০৯	দেশের পশুতেই কোরবানি, সচল হচ্ছে দেশের অর্থনীতি	১১-১২
১০	ভাসমান খাঁচায় কোরাল চাষে সফলতা	১৩
১১	কপোতাক্ষের পাড়ে ইউরোপীয় কায়দায় কাঁকড়া চাষ, রপ্তানি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়	১৪
১২	দেশি মুরগি পালনে মাসে লাখ টাকা আয় পুতুলের	১৫
১৩	কাপ্তাই লেক দেশের সম্পদ, এটাকে রক্ষা করতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৬
১৪	ভেড়া পালনে ভাগ্যবদল রংপুরের তিন শতাধিক নারীর	১৭
১৫	পার্বতীপুরে ট্যাংকে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী গ্রামের মানুষ	১৮-১৯
১৬	‘পোলট্রি পল্লি’ গ্রামের বাড়িগুলো যেন একেকটি খামার	১৯-২০
১৭	মাছের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বা পিজি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের কৌশল	২০-২১
১৮	কক্সবাজারের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হচ্ছে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২১
১৯	দুম্বার খামারে বাদলের ভাগ্যবদল	২২
২০	ইনোভেশন যত বেশি পরস্পর আদান-প্রদান করা যাবে, তত বেশি সফল হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২২-২৪
২১	ছোট মাছের বড় পুষ্টিগুণ	২৪
২২	হাওরে ইজারা বন্ধ করতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৫
২৩	বিএফআরআই-এর গবেষণায় কার্পজাতীয় মাছের পঞ্চম নতুন প্রজনন কেন্দ্র আবিষ্কার	২৬
২৪	৪টি দিয়ে শুরু এখন ২৬টি গরুর মালিক	২৬-২৭
২৫	নারী খামারিদের জন্য প্রকল্প নিচ্ছে সরকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৭
২৬	কুড়িগ্রামে গলদা চিংড়ি চাষে সফলতা	২৮
২৭	ভূরুঙ্গামারীতে চরাঞ্চলের খামার পরিদর্শন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব	২৮-২৯
২৮	চামড়া সংরক্ষণে বিনামূল্যে ৩০ হাজার টন লবণ দেবে সরকার	২৯
২৯	এক জোড়া দিয়ে শুরু, এখন ৭শ পাখির এক খামারে সাবলম্বী দম্পতি	২৯
৩০	গরু মোটাতাজাকরণ উদ্যোগ রাজশাহীর গ্রামবাসীদের ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে	৩০
৩১	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব	৩০
৩২	বর্ষাকালে মাছ চাষে করণীয়	৩১
৩৩	এ বছর ঈদ-উল আযহায় ৯১ লাখের বেশি পশু কোরবানি হয়েছে	৩২

কোরবানির ঈদের জন্য পশু আমদানি করা হবে না : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দেশে চাহিদার চেয়ে বেশি গবাদি পশু থাকায় চলতি বছরে কোরবানি ঈদের জন্য পশু আমদানি করা হবে না। অবৈধ পথে কোনোভাবেই গবাদি পশু প্রবেশ করতে দেয়া হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজ থেকেই গবাদি পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। উপদেষ্টা রবিবার (৪ মে ২০২৫) দুপুরে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর অবাধ চলাচল ও পরিবহন নিশ্চিতকল্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। কোরবানির পশু সরবরাহের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা থাকবে জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, চলতি বছর ঈদে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনে করে পশু সরবরাহ করা হবে। রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৯টি পশুর হাটে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে ২০টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম ও দুইটি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম নিয়োজিত থাকবে। তিনি আরও বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য গবাদি পশু কোরবানি। কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সারা দেশে পশুর চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ এবং কোরবানির পশুর অবাধ বিচরণ নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। এছাড়া নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান পশুর ক্রয়-বিক্রয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু কোরবানি করা প্রয়োজন। কোরবানি উপলক্ষ্যে সরকারের প্রস্তুতি তুলে ধরে তিনি বলেন, সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাণীর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর সংখ্যা নিরূপণ করেছে। এ বছরে কোরবানিযোগ্য হৃষ্টপুষ্টকৃত গবাদিপশুর মধ্যে ৫৬ লাখ ২ হাজার ৯০৫টি গরু-মহিষ, ৬৮ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০টি ছাগল-ভেড়া এবং ৫ হাজার ৫১২টি অন্যান্য প্রজাতিসহ সর্বমোট ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৭টি গবাদিপশুর প্রাপ্যতা আশা করা যাচ্ছে। এ বছর প্রায় ২০ লাখ ৬৮ হাজার ১৩৫টি গবাদিপশুর উদ্বৃত্ত থাকবে বলে আশা করছি। কোরবানির ঈদে বাজার যেন কেউ অস্থিতিশীল করতে না পারে এজন্য সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, চাঁদাবাজির কারণে পশুর দাম যেন না বাড়ে সেজন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করেছি, যেকোনো সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে করেন উপদেষ্টা। সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

"দেশের পশুতে কোরবানি আর হবে না আমদানি"

গবেষণা করে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজাতির আইড় মাছের সন্ধান

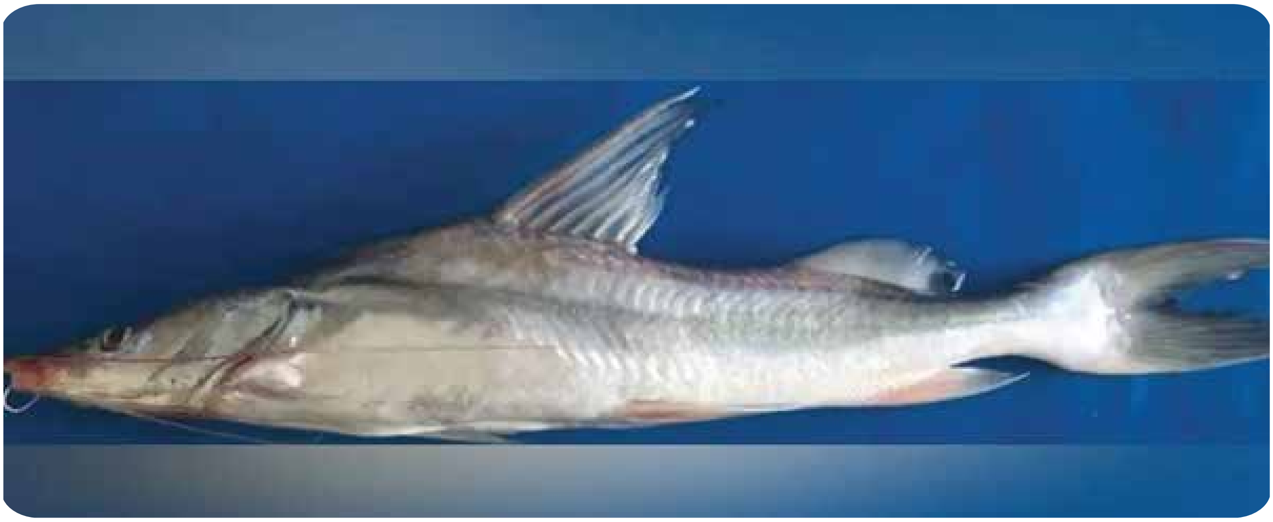

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদে গবেষণা করে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজাতির আইড় মাছের সন্ধান পেয়েছে। এ কথা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও নদী উপকেন্দ্র রাঙ্গামাটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার। তিনি জানান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা আইড় মাছের বাহ্যিক গঠন এবং অন্যান্য দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় 'স্পেরেটা অরেলা' ও 'স্পেরেটা সিনঘলা' হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নতুন আইড় মাছের সন্ধান পান কাপ্তাই হ্রদ হতে। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন এ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম 'স্পেরেটা অরেলা'। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) ২০১৫ এর তথ্যমতে 'স্পেরেটা অরেলা' ও স্পেরেটা সিনঘলা' প্রজাতি দু'টি বিপন্ন প্রজাতির মূল্যবান মাছ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। পরে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত নমুনায় 'স্পেরেটা অরেলা' নামক আইড় মাছের রেফারেন্স জিনোমের সঙ্গে শতভাগ মিল পাওয়া যায়। মাছটির দেহের তুলনায় তুলনামূলক দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা, ম্যাক্সিলারি বারবেল, চোয়াল, এডিপোজ ফিন, অক্সিপিটাল প্রসেস এবং এপিনিউরাল শিল্ড ইত্যাদির গঠন বাকি দুই প্রজাতির আইড় মাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি তুলনামূলক ছোট প্রজাতির আইড়, ওজন ১-১.৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির পৃষ্ঠদেশ ধূসর, পেটের দিক সাদাটে এবং দেহের দুই পাশ রুপালি বর্ণের। মাছটির দেহ লম্বা ও সরু, চোয়াল থেকে পৃষ্ঠ পাখনার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত সমানভাবে ঢালু, এডিপোজ ফিন খাটো এবং দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠীয় পাখনার প্রায় সমান, চোখের সম্মুখ অংশ অপেক্ষাকৃত লম্বা, অক্সিপিটাল স্পাইন দীর্ঘ এবং এপিনিউরাল শিল্ড সরু। এর মাক্সিলারী বারবেল এর মতো প্রায় পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চোয়াল 'স্পেরেটা সিনঘলা' এর মতো স্পষ্টভাবে ছাঁটা। এই গবেষক দলে ছিলেন, বিএফআরআইয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আজহার আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রবিউল আউয়াল হোসেন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার ও বি. এম. শাহিনুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. খালেদ রহমান, রাবিনা আক্তার লিমা, মো. ইমদাদুল হক এবং মো. লিপন মিয়া। (সূত্র : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ২৭ মে ২০২৫)

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) প্রতিরোধে করণীয়:

AMR কী?

অতিরিক্ত বা ভুলভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে জীবাণু ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। তখন ওষুধ দিয়ে আর রোগ সারে না-একেই বলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বা AMR।

AMR এর ক্ষতিকর দিক:

- মুরগির রোগ সহজে ভালো হয় না
- ওষুধে কাজ না করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে
- চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায়
- মুরগির মাংস ও ডিমে ওষুধের অবশিষ্টাংশ রয়ে যায়, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর

কিছু তথ্য:

- বিশ্বে প্রতি বছর ৫০ লাখের বেশি মানুষ AMR-জনিত কারণে মারা যায়
- ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৬,০০০ মানুষ AMR জনিত কারণে মারা যায়

(তথ্যসূত্র: WHO, Uni. of Washington)

আপনি নিজের খামারকে নিরাপদ ও অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত করে তুলতে AMR বিষয়ক নির্দেশনা মেনে চলুন। আসুন, সচেতন হই-নিরাপদ মুরগির মাংস ও ডিম নিশ্চিত করি!

সচেতন খামারিরা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খামারে ব্যবহার করবেন না। যদি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রত্যাহার কাল মেনে চলবেন।

জনসচেতনতায়: আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার বরিশাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৮ থেকে ১৪ এপ্রিল জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করবে সরকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

জাটকা সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ৮ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৫' পালিত হবে। তিনি আরও বলেন, 'যদি জাটকা সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে ইলিশের উৎপাদন অনেক গুণে বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে বাজারেও এর প্রভাব পড়বে, সরবরাহ বাড়বে, দামও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। উপদেষ্টা সোমবার (৭ এপ্রিল ২০২৫) দুপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ইলিশকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ৮ থেকে ১৪ এপ্রিল পালন করা হবে। তিনি বলেন, এ বছরে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয়েছে 'জাটকা ধরা বন্ধ হলে, ইলিশ উঠবে জাল ভরে'। জাটকা হচ্ছে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সে.মি. ছোট আকারের ইলিশ। এক কেজি ওজনের ইলিশ কমপক্ষে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার এবং ২ কেজির অধিক হলে ৬০-৬২ সেন্টিমিটার হবে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের মাধ্যমে জাটকাকে ইলিশ রূপান্তর করা হবে। এ সময় তিনি বলেন, বিগত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে দেশে ৫ লাখ ২৯ হাজার মে.টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান প্রায় ১১ শতাংশ। দেশজ জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশের বেশি। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী, মোহনা ও সাগর থেকে। ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানে রয়েছে। মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, সরকার জাটকা রক্ষায় কেবল আইন প্রয়োগ করছে না; বরং এই মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসে ২৮ হাজার ৮৮৫ মে.টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়েছে। ইলিশের প্রধান মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৬৫টি জেলে পরিবারকে ২৫ কেজি হারে খাদ্য সহায়তা হিসেবে মোট ১৩ হাজার ৭০৭ মে.টন ভিজিএফ (চাল) দেয়া হয়েছে। ভিজিএফ সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" এর মাধ্যমে জেলেদেরকে তাদের চাহিদানুযায়ী বকনা বাছুরসহ নানা প্রকার উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উপদেষ্টা জাটকা রক্ষায় সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, 'ইলিশ ধরা বন্ধ থাকলেও উৎসব থেমে থাকবে না; বরং আমাদের ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সচেতনতার এই সুযোগটাও বড় উৎসবের অংশ হতে পারে। 'মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা-২০২৩ এর ৩(১) বিধি অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রতিবছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সব প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যেকোনো ধরনের মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ১২.৭৮ শতাংশ বাড়ার রেকর্ড রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়, যাতে সামুদ্রিক মৎস্য বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কমিটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাদি যাচাই করে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ দিন নির্ধারণের সুপারিশ করে। এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গত ১৬ মার্চ ২০২৫ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। তিনি বলেন, সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ সংশোধন করে সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ ও টেকসই মৎস্য আহরণের জন্য প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ দিন সব প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ এটা কোনো সংস্কৃতির অংশ নয়। যারা ঢাকায় থাকেন তারা এটা চালু করেছেন। এটা আরোপিত সংস্কৃতি। তিনি এ বছর পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ না খাওয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ ২০টি জেলায় (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও সিরাজগঞ্জ) 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৫' উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ০৮ এপ্রিল বরিশাল বিভাগের ইলিশ সমৃদ্ধ অন্যতম জেলা বরিশাল জেলার সদর উপজেলার বেলস্ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বরিশাল সদর উপজেলার ডিসি ঘাট সংলগ্ন কীর্তনখোলা নদীতে নৌ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. তোফাজ্জেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব মো.

ইমাম উদ্দীন কবীর, অতিরিক্ত সচিব আমেনা বেগম, অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

বেশি মাংস ও বেশি ডিম দেয় নতুন প্রজাতির 'বাউ-ডাক'

দুপুরের নরম রোদে হাঁসের খামার ঘুরে দেখছিলেন সিরাজগঞ্জের খামারি আবদুস সালাম। তাঁর এক ডাকে পুকুরপাড় থেকে দৌড়ে এল একঝাঁক হাঁস। খামারে ঢুকেই বললেন, ১২ বছর ধরে হাঁস পালছি এত লাভজনক জাত আগে দেখিনি। 'সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার চয়ড়া গ্রামে আবদুস সালামের খামার। একসময় দেশি হাঁস পালতেন, কিন্তু মৃত্যুর হার বেশি বলে লাভের মুখ দেখাটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি পালা শুরু করেছেন নতুন জাতের হাঁস 'বাউ-ডাক'। অভিজ্ঞতা কী, জানতে চাইলে আবদুস সালাম বলেন, 'আগে হাঁস পালনে যা আয় করতাম, তা দিয়ে চলা কঠিন ছিল। আর এখন মাত্র ১০-১২ সপ্তাহেই দুই-আড়াই কেজি হয়ে যায় বাউ-ডাক, আর বছরে ২২০ থেকে ২৩০টি ডিম দেয়। দেশি হাঁসের তুলনায় এটাতে লাভ বেশি। 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি)' পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের একদল গবেষক ২০১৪ সালে হাঁসের জাত উন্নয়নে গবেষণা শুরু করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামছুল আলম ভূঁঞার নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। অধ্যাপক সামছুল আলম ভূঁঞা বলেন, 'হাঁসের ডিম ও মাংস উৎপাদনে খামারিরা যেন লাভবান হন, সে জন্যই দেশি-বিদেশি জাতের হাঁসের সংকরায়ণ নিয়ে গবেষণা হয়। গবেষণাগার ও মাঠপর্যায়ের পরীক্ষা শেষে ২০২০ সালে জাতটি সরকারিভাবে অনুমোদন পায়। চীনের পেকিং জাতের হাঁস ও দেশি নাগেশ্বরী জাতের হাঁসের ক্রস ব্রিডিং করে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়। পেকিন হাঁস বেশি মাংস উৎপাদনকারী হলেও কেবল বদ্ধ পদ্ধতিতে টিকে থাকে। এটি দেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও পরিবেশগত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না বলে আধা-বদ্ধ বা উন্মুক্ত রাখলে দৈহিক বৃদ্ধি কম হয়। আবার ডিমও কম দেয়। অন্যদিকে দেশি নাগেশ্বরী হাঁস পরিবেশ সহনশীল হলেও মাংস উৎপাদন কম। এ সমস্যা সমাধানে দুটি জাতের সংকরায়ণ করে উদ্ভাবিত হয় 'বাউ-ডাক'। বাউ-ডাক বদ্ধ ও উন্মুক্ত দুই জায়গাতেই সুবিধাজনক। উল্লাপাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. শেখ এম এ মতিন বলেন, 'বাউ-ডাক দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ওজন দ্রুত বাড়ে, রোগবালাই কম, আর ডিমও দেয় বেশি। তাই এটি খামারিদের জন্য লাভজনক। মাঠপর্যায়ে গবেষণার সাফল্য নিয়ে গবেষক অধ্যাপক সামছুল আলম ভূঁঞা বলেন, 'আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি উন্নত জাতের হাঁস উদ্ভাবন, যা দেশি হাঁসের মতো পরিবেশ সহনশীল হবে। আবার বিদেশি জাতের মতো বেশি মাংস ও ডিম উৎপাদন করবে। দীর্ঘ ছয় বছরের গবেষণায় আমরা সেটি করতে পেরেছি। বাউ-ডাক এখন খামারিদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে, যা আমাদের কাজেও অনুপ্রেরণা জোগায়।' (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০২৫)

কাপ্তাইয়ে সাক্রাছড়ি জলাশয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার ওয়াজ্জা ইউনিয়নের সাক্রাছড়ির বাসিন্দা অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ক্রিক জলাশয়ে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পাদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ের ঢালুতে ক্রিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করে ইতোমধ্যে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছে। গত ২০২৪ সালের আগষ্ট মাসে সাক্রাছড়ির পাহাড়ের পাদদেশে উন্নয়নকৃত ক্রিকে কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের বাস্তবায়নে ক্রিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার শুরু করে। এর আগে অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে উপজেলা মৎস্য অফিস হতে মাছের পোনা, খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান। কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য অফিস জানায়, মৎস্য চাষী অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার ক্রিক প্রদর্শনী মৎস্য খামারের প্যাকেজের নাম কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ। যেটি ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে উপজেলা ওয়াজ্জা ইউনিয়ন সাক্রাছড়ি এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনীর আয়তন ০.৪০ হেক্টর এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ৮ জন। মৎস্যচাষি অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা জানান, পারিবারিক ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ছোট বেলা থেকেই মৎস্য চাষে আগ্রহী হন। পরে তিনি নিজ উদ্যোগে বাড়ির আঙিনায় পুকুর করে মাছ চাষ শুরু করার পরিকল্পনা করেন। এরপর কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য অফিসের সহযোগিতা নিয়ে ক্রিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার করা শুরু করেন। নিজের ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ করে এবং সরকারি সহযোগিতায় তিনি মৎস্য চাষে নেমে যান। তার খামারে কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতাল, মৃগেল, সিলভার ও গ্রাসকার্প জাতের মাছ চাষ হয়েছে। ইতোমধ্যে মাছের আকার বড় হচ্ছে। সহসায় তিনি মাছ আহরণ শুরু করবেন বলে জানান। কিভাবে পরিচর্যা করেন এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মৎস্য অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্য খামারে পরিচর্যা করেন। এছাড়া উপজেলার সিনিয়র মৎস্য অফিসারেরা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কাপ্তাই উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বিমল জ্যোতি চাকমা জানান, পার্বত্য এলাকা দুর্গম। এখানে মাছ চাষের সুযোগ-সুবিধা কম। তবে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষে জলাশয় বা পুকুর তৈরি করলে দুর্গম এলাকার মানুষের মাঝে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। তারই প্রেক্ষিতে কাপ্তাই উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ক্রিক বা ঝিরিতে বাঁধ দিয়ে জলাশয় তৈরি করে সুযোগ করে দিয়েছে। এই জলাশয় থেকে একদিকে মাছ চাষের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে খরা মৌসুমে সেচ হিসেবে পানি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। পাহাড় পর্বতের পানির অভাব পুরণেও এই ক্রিক জলাশয় ভূমিকা রাখছে। অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার তার পারিবারিক ভরণ-পোষণ থেকে শুরু করে সংসার চলছে এই পেশার মাধ্যমে। অমল তঞ্চঙ্গ্যা ছাড়া কাপ্তাইয়ের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে ৬টি ক্রিক প্রদর্শনী খামার রয়েছে। তারাও মাছ চাষে লাভবান হচ্ছে। ক্রিক মাছ চাষ শুরু করার পূর্বে চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরামর্শ দেওয়া হয় এবং মৎস্য চাষ চলাকালীন তাদের মৎস্য খামার পরিদর্শন ও বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। অমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার ক্রিক চাষ পদ্ধতি দেখে আশপাশের অনেকেই এগিয়ে আসছে মাছ চাষ করার জন্য। (সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫)

"সঠিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করি"

সামুদ্রিক মৎস্যখাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

বাংলাদেশের মৎস্যখাতে দক্ষিণ কোরিয়া কারিগরি সহায়তার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, সামুদ্রিক মৎস্য এবং এ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, মেরিকালচার ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার পোর্ট সিটি বুসানে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মৎস্য বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার এবং জাতীয় মৎস্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের (NIFS) প্রেসিডেন্ট চোল ইয়ং সি এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা গভীর সমুদ্রে অবৈধ মাছ ধরার বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার, গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরায় সক্ষমতা অর্জন, সামুদ্রিক সম্পদের মজুদ নির্ণয়ে সহায়তা, সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষকদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান, মূল্য সংযোজন পণ্য উন্নয়ন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উপদেষ্টা কোরিয়ান মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সরকার সাধারণ মানুষের আমিষ চাহিদাপূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানতে পেরেছেন যে, কোরিয়ান সরকার তার জনগণকে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মাছের জোগান দেয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে উভয় দেশেরই কমন ও বৈশ্বিক অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রে দূষণ, আইইউই ফিশিং, অধিক মৎস্য আহরণ, অবৈধ ফিশিং গিয়ার ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপদেষ্টা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্র একত্রে কাজ করতে পারে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ জন্য উভয় দেশের সরকার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে মর্মে উপদেষ্টা প্রস্তাব করেন। কোরিয়ার ভাইস মিনিস্টার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, মৎস্যখাতে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ভাইস মিনিস্টার আশ্বস্ত করেন, দক্ষিণ কোরিয়া সরকার মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় খুঁজে বের করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আলোচনার ক্ষেত্রগুলোতে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আরও সহযোগিতার বিকাশ উভয় পক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভাইস মিনিস্টার আরও বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যেই অবৈধ মাছ ধরার পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরার ট্র্যাকিং-এর অত্যাধুনিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। নির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশকে কোরিয়া সহযোগিতা করতে পারে। তিনি প্রযুক্তিগত গবেষণা সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সাক্ষাতের সময় কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তৌফিক ইসলাম শাতিল উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএফডিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) সুরাইয়া আখতার জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুর রউফ এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ৫ দিনের সরকারি সফরে দক্ষিণ কোরিয়াতে অবস্থান করছেন। সফরকালে তিনি কোরিয়া মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (কেএমআই) এর সভাপতি, কোরিয়ান ফিশারিজ রিসোর্সেস এজেন্সি (এফআইআরএ) এর সভাপতি, পুকিয়ং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, কোরিয়া ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিসহ অন্যান্যদের সাথেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বুসান ফিস প্রসেসিং এবং এক্সপোর্ট সেন্টার গং সুফিস ভিলেজ পরিদর্শন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান**, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

দুগ্ধের অপার শক্তিতে, মেতে উঠি একসঙ্গে

সরকার স্থানীয় জাতের গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থানীয় জাতের গবাদি পশুর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে যেখানে স্থানীয় জাতের গবাদি পশুর দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৩-৪ লিটার সেখানে উচ্চ ফলনশীল ঘাস খাওয়ানোর ফলে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ৪-৫.৫ লিটার সম্ভব। দুধের মতো সর্বজনীন পানীয় তথা খাদ্যোপকরণ পৃথিবীতে আর দুটি খুঁজে পাওয়া ভার। সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে বিশ্বের সর্বত্র দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খাওয়া ও পান করা হচ্ছে। তবে ঠিক কখন মানুষ প্রথম তৃণভোজী পশুর দুধ দোহন করে নিজেরা পান করতে শুরু করেছে তা আজও জানা যায়নি। বিশ্বব্যাপী দুধের গুরুত্বকে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর পালন করা হয় বিশ্ব দুগ্ধ দিবস। দুধের পুষ্টিগুণ তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দুধ সম্পর্কে সকল অপপ্রচার রোধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সর্বপ্রথম ২০০১ সাল থেকে ১ জুনকে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে-'লেটস সেলিব্রেট দ্য পাওয়ার অব ডেইরি' অর্থাৎ 'দুগ্ধের অপার শক্তিতে, মেতে উঠি একসঙ্গে'। এ প্রতিপাদ্যটি দুগ্ধ শিল্পের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থায় অবদানের গুরুত্ব তুলে ধরতে আহ্বান জানায়। এই বছরের প্রতিপাদ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুধ কেবল একটি পুষ্টিকর খাদ্য নয়, এটি একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবনের প্রতীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ, ২০২৫) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে গরুর দুধ উৎপাদন হয়েছে ৬৭৩.২৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন; যা পূর্বের বছরের তুলনায় ০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এফএও এবং ইউএসডিএ এর হিসাবমতে বিশ্বে উৎপাদিত দুধের মধ্যে ৮১ শতাংশ গরুর দুধ, ১৫ শতাংশ মহিষের দুধ, ২ শতাংশ ছাগল, ভেড়া ১ শতাংশ ও উটের দুধ ০.৪ শতাংশ। এফএও এর ২০২৫ সালের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু দুগ্ধজাত পণ্যের গ্রহণ উচ্চ; যেমন-ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনায় প্রতি বছর মাথা পিছু ১৫০ কেজির বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাথাপিছু গ্রহণ মাঝারি; প্রতি বছর ৩০ থেকে ১৫০ কেজির মধ্যে। ভারত, পাকিস্তান, মেক্সিকো ও কলম্বিয়ায় এ পরিমাণে দেখা যায়। কম গ্রহণের দেশগুলোতে মাথাপিছু গ্রহণ কম; প্রতি বছর ৩০ কেজির নিচে। ইরান, সেনেগাল, থাইল্যান্ড এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ। বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু তাজা দুগ্ধজাত পণ্যের গ্রহণ আগামী দশকে প্রতিবছর ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে। বাংলাদেশ মাথাপিছু দুধ গ্রহণ এখনো বিশ্বে গড়ের তুলনায় কম। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ক্রমবর্ধমান জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১.৮ শতাংশ। দেশে বছরে দুধের চাহিদা প্রায় ১ কোটি ৫৯ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু বর্তমানে দুধ উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদিত দুধের ৯০ শতাংশ আসে গরু, ৮ শতাংশ আসে ছাগল এবং ২ শতাংশ আসে মহিষ থেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেখানে প্রতিদিন জনপ্রতি অন্তত ২৫০ মিলিলিটার দুধ গ্রহণের কথা বললেও আমরা মাথাপিছু প্রতিদিন জনপ্রতি ২৩৪.৪৫ মিলিলিটার দুধ গ্রহণ করছি। দুধের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংকরায়ণের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমাতে পশুখাদ্যের ক্ষেত্রে সবুজ ঘাসের চাষ ও ব্যবহার বাড়ানো, রোগ প্রতিরোধ করা, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং অপরদিকে ডেইরি হাব ও গ্রামের দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র (ভিএমসিসি) স্থাপনের মাধ্যমে দুধ বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে সংযোগ স্থাপন করার কার্যক্রম চালু রেখেছে। সরকার স্থানীয় জাতের গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থানীয় জাতের গবাদি পশুর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ডিমের উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সরকার সম্মিলিত প্রয়াস নিয়েছে। ডেইরি সেক্টরের উন্নয়ন তথা দুধের পুষ্টি সবার জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ সহায়তায় বৃহৎ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং আরও নতুন নতুন বিনিয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খামারি সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সংযোগে সহায়তা, এমনকি স্কুল মিল্ক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দুধের পুষ্টির বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য রয়েছে। পোস্ট হার্ভেস্ট ডেইরি তথা দুধের উৎপাদন পরিবহন প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী নির্বাচিত স্কুল ও এতিমখানায় শিশুদের দুধ পান করানো, সুসজ্জিত র‍্যালি আয়োজন করা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুধের পুষ্টি ও উপকারিতা, স্বাস্থ্য ও মেধা বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয়ভাবে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন, সুধীজন সমাবেশ, সেমিনার আয়োজন, মিডিয়ায় প্রচারণা ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে সরকারিভাবে প্রকাশিত পুষ্টি নির্দেশিকা অনুযায়ী গরুর পূর্ণ চর্বিযুক্ত দুধে ১০০ মিলিলিটার গরুর দুধে ৬৬ ক্যালরি রয়েছে। গরুর দুধে পানি আছে ৮৭.৫ শতাংশ, শর্করা ৪.৬ শতাংশ, চর্বি ৩.৭ শতাংশ, আমিষ ৩.৫ শতাংশ এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ০.৭ শতাংশ। দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি-উপাদান। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাংগানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, কপার, জিংক, আয়োডিন, ফসফরাস, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন বি-১২, নিয়াসিন ও রিবোফ্লাভিন প্রভৃতি রয়েছে; যা শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে উন্নত করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গাভী থেকে যে দুধ সংগ্রহ করা হয়; হোল মিল্ক-কোনো উপাদান আলাদা করা

ছাড়া দুধ; ড্রাই মিল্ক বা পাউডার দুধ-দুধের ৯৫ শতাংশ পানি সরানো হয়; ইভাপোরেটেড দুধ-এ ক্ষেত্রে দুধের ৬০ শতাংশ পানি সরানো হয়; কনডেন্সড মিল্ক-চিনি মিশানো ইভাপোরেটেড দুধ; ফর্টিফায়েড মিল্ক-এক বা একাধিক বাড়তি পুষ্টি উপাদান মেশানো দুধ; ফ্লেভারড মিল্ক-চিনি, রং, ফ্লেভার মেশানো দুধ; স্কিমড মিল্ক- ক্রিম ছাড়া দুধ এবং ফার্মেন্টেড মিল্ক-প্রক্রিয়াজাতকারী দুধ (বাটার, পনির, ঘি, দই ও মাখন ইত্যাদি)। দুধ থেকে দই, মাঠা, ছানা, পাস্তুরিত তরল দুধ, গুঁড়ো দুধ, ঘি, মাখন, পনির, লাচ্ছি, লাবাং, আইসক্রিম ও চকলেটসহ নানা ধরনের উপাদেয় মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। দুগ্ধজাত পণ্য ও টক দই উত্তম ব্যাকটেরিয়ার উত্তম উৎস। প্রোবায়োটিক নানা ধরনের টিউমার রোধ করে। দুধের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড় ও দাঁতের ক্ষয়রোধ করে দাঁত মজবুত করে। দুধ হাড়ের অস্টিওপোরোসিস রোগ প্রতিরোধ করে। পটাশিয়াম রক্তচাপ বাড়তে দেয় না। ভিটামিন, মিনারেল ফিটনেস বাড়ায় ও মানসিক চাপ কমায়। ফলে ঘুম ভালো হয়। অনেকে মনে করে দুধ খেলে ওজন বাড়ে। তবে এটি মোটেও ঠিক নয়। দুধ খেলে বরং ওজন কমে, দুধের প্রোটিন দীর্ঘ সময় পেটে থাকে এতে ক্ষুধার চাহিদা কম হয় যা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। দুধে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। দুধ পানে প্রচুর সেরোটোনিন নিঃসৃত হয়। সেরোটোনিনের মাত্রা ঠিক থাকলে মানুষ ধকল ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। যা মনকে ফুরফুরে রাখে। একে হ্যাপি হরমোন বলে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও বুদ্ধির বিকাশে দুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে দুগ্ধ খাত শুধু পুষ্টির দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিকভাবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লাখ লাখ মানুষ গরু-ছাগল পালনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদনে নিয়োজিত। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা এ খাতের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে অনেক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, যা কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দুগ্ধ শিল্পে দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ জড়িত। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে বর চাইতে গিয়ে ঈশ্বরী পাটনি বলেছিলেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' এই বাক্যের পিছনে লুকিয়ে আছে এক চিরায়ত বাঙালি মায়ের আকুতি। বস্তুত সব বাঙালি মায়েরা এটা কামনা করেন, তার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। চন্দ্রবিন্দুব্যান্ডের জনপ্রিয় ব্যঙ্গধর্মী গান দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে পড়াশুনো করবে না, ডাক্তার হবে না! "আমরা শুনেছি। দুধ না খেলে ভালো ছেলে হওয়া যাবে কিনা এ বিষয়ে বির্তক থাকলেও, ভালো স্বাস্থ্য কিন্তু পাওয়া যাবে না সেটা নিশ্চিন্তে বলা যায়। কারণ মানুষের খাদ্যতালিকায় দুধ অন্যতম সর্বোচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার। এজন্য দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যগুলো কখনই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিত নয়। দুধের অপরিহার্য উপাদান ল্যাকটোজ, যা দৈহিক গঠন ও মেধাবিকাশে সহায়ক। অনুরূপভাবে দুধের চাহিদা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ করা সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। তবে অর্জন, দেশের অনেক সেক্টরের উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে। যেমন ভোক্তার সচেতনতা, বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবহন সেক্টরের উন্নয়ন এবং ডেইরি সেক্টরে বিনিয়োগকারী সম্পৃক্ত করা। তবে ডেইরি সেক্টরের অধুনা উন্নয়ন গতি আমাদের এই বার্তা দেয় যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব নয়। বিশ্ব দুগ্ধ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় দুধের পুষ্টিগুণ ও দুগ্ধ খাতের বহুমুখী গুরুত্ব। পুষ্টি ও অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে হলে এ খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই সবাইকে দুধ পান করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং খাতটির উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাই নিয়মিত দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠুন। **লেখক: মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সফল খামারি রাশেদ-এর বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ টাকা

রাজশাহী জেলার বেলপুকুর থানার রাশেদ মিয়া ২০২২ সালে ব্যবসার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে ০৫ টি গরু নিয়ে একটি গবাদি পশুর খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ১০টি ষাঁড় গরু ৫টি গাভি ও ৪টি বকনা গরু আছে। রাসেদের খামার থেকে বছরে আয় আসে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা। শুধু কুরবানির সময় গরু বিক্রি করে তার লাভ হয় ২ লাখ টাকা। তিনি বলেন, প্রতিদিন খামার হতে ১৫০ লিটার দুধ সংগ্রহ করেন। তিনি তার বাসা থেকে প্রতি কেজি দুধ ৬০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তার খামারে ৩ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তাদের বেতন বাবদ মাসিক ৪৫,০০০ টাকা প্রদান করতে হয়। খামারের বাৎসরিক ব্যয় সম্পর্কে জানতে চাইলে খাবার, মেডিসিন ও কর্মচারীর বেতন বাবদ ব্যয় হয় সাড়ে ৮ লাখ টাকা এবং বাৎসরিক আয় বাবদ তার খামার থেকে আসে সাড়ে ৪ লাখ টাকা। খাবার ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে রাশেদ বলেন, ঘাস এবং ভুট্টা চাষ করে সাইলেজ তৈরি করেন। ঘাস খাওয়ার পাশাপাশি তিনি দানাদার খাদ্য হিসাবে গমের ভুষি, ফিড, ভুট্টার গুড়া, চালের গুড়া, খৈল ও নালীগুড় খাওয়ান। খামার বাসস্থান সম্পর্কে রাশেদ বলেন, প্রতি ৫ দিন পর পর খামার পরিষ্কার করা হয়। কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উপজেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। রাশেদ মিয়া আরও জানান, খামারে গবাদি পশুর রোগ হলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করেন এবং প্রাণিসম্পদ অফিস বিভিন্ন সহযোগিতা করেন। প্রতিবেদক : **মো. খাদেমুল ইসলাম,** কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী।

দেশের পশুতেই কোরবানি, সচল হচ্ছে দেশের অর্থনীতি

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য গবাদিপশু কোরবানি করা। দেশের জাতীয় অর্থনীতিতেও একটি বিশাল জায়গা দখল করে আছে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। মুসলমানদের এই উৎসবের উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক না হলেও অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অনেক। কোরবানি উপলক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী যে লেনদেন হয়, অর্থনীতিতে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রতিবছর সারাদেশে কোরবানি উপলক্ষ্যে সপ্তাহখানেক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। সঠিক পরিকল্পনা ও হিসাব না রাখার কারণে এই লেনদেন থেকে একদিকে যেমন সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে অপরদিকে তা দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ধারণা করা হয়, কোরবানি কেবল গবাদিপশুর বেচাকেনার অর্থনীতি। প্রকৃতপক্ষে কোরবানি হলো বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা; যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির চাকায় আরও গতি সঞ্চার করে। কোরবানি হলে একদিকে যেমন গবাদিপশু ক্রয় করেন কোরবানি দাতারা, তেমনি অন্যদিকে খামারি বা প্রান্তিক কৃষকরা গবাদিপশু বিক্রি করে তাদের প্রয়োজনীয় সওদা করেন। এর সাথে যুক্ত হয় মসলার বিরাট বাজার, কোরবানির পশুর খাবার, জবাই করার ছুরি-চাকু, মাংস কাটার সরঞ্জামাদি, কোরবানির পশুর মাংস কাটা ও বণ্টনের জন্য কর্মীদের আয়-রোজগার, কোরবানির পশুর চামড়া ক্রয়-বিক্রয়। এসব মিলিয়ে এক বিরাট অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে কোরবানিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রভাব। দেশের অর্থনীতিতে কোরবানির অবদান অনস্বীকার্য। কোরবানির আগে ও পরে কোরবানির ঈদকে উপলক্ষ্য করে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। আর এই মহা কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করে লাখো-কোটি মানুষের অস্থায়ী কর্মসংস্থান এবং আয়-রোজগারের ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে দেশের জিডিপিও সমৃদ্ধ হয়। জানা যায়, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর সংখ্যা নিরূপণ করেছে। এ বছর কোরবানিযোগ্য সর্বমোট ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৭টি গবাদিপশুর প্রাপ্যতা আশা করা যাচ্ছে। এবার হৃষ্টপুষ্টকৃত গবাদিপশুর মধ্যে ৫৬ লাখ দুই হাজার ৯০৫টি গরু-মহিষ, ৬৮ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০টি ছাগল-ভেড়া এবং ৫ হাজার ৫১২টি অন্যান্য প্রজাতি রয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও প্রায় ২০ লাখ ৬৮ হাজার ১৩৫টি গবাদিপশু উদ্বৃত্ত থাকবে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়। গত বছর দেশে কোরবানিযোগ্য পশু ছিল ১ কোটি ২৯ লাখ; এর মধ্যে কোরবানি হয়েছে ১ কোটি ৪ লাখ। ২০২৪ সালে শুধু কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় উপলক্ষ্যে লেনদেন হয় ৬৯ হাজার ১শ ৪১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। যার সিংহভাগই যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। এছাড়া গত বছর অনলাইন প্ল্যাটফরমে ৪ হাজার ৭শ ৪০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫.০৫ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রি হয়েছে। সরকারি নিয়মানুসারে, প্রতিটি গরু-মহিষ, দুম্বা বা ছাগল ও উটের জন্য বিক্রয়মূল্যের ৫% হারে রাজস্ব দিতে হবে (সূত্র: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন)। এবার শুধু ৫৬ লাখ দুই হাজার ৯০৫টি গরু-মহিষ থেকেই সরকারের রাজস্ব পাওয়ার কথা প্রায় ৩০ কোটি টাকা। অন্যান্য পশু মিলিয়ে প্রায় ৬০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা। এছাড়া এবছর কোরবানি হওয়া ৫৬ লাখ দুই হাজার ৯০৫টি গরু-মহিষের প্রত্যেকটি চামড়ার মূল্য গড়ে ১ হাজার টাকা ধরলে এর মূল্য হয়

প্রায় ৫৬১ কোটি টাকা। আবার ৬৮ লাখ ৩৮ হাজার ৯২০টি ছাগল-ভেড়ার প্রত্যেকটির চামড়ার মূল্য ১০০ টাকা ধরলেও এ বাবদ হয় ৬৮.৫০ কোটি টাকা। কোরবানি উপলক্ষ্যে গরু এবং ছাগলের চামড়া মিলিয়ে এই পুরো টাকা যাচ্ছে সরাসরি গরিবদের হাতে। অন্যদিকে প্রতিবছর ঈদ-উল আযহায় বছরে উৎপাদিত মোট চামড়ার প্রায় ৬০ শতাংশ সংগৃহীত হয়। চামড়া শিল্প দেশের প্রধান রপ্তানি খাতগুলোর অন্যতম। আয়ের দিক থেকে দেশে তৈরি পোশাক খাতের পরে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হলো চামড়া। শিল্প আয়ে এ খাতের অবদান ২ শতাংশ আর রপ্তানির ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। দেশীয় জিডিপিতে চামড়াশিল্পের অবদান প্রায় শুন্য দশমিক ৬০ শতাংশ। কোরবানির ওপর ভর করেই টিকে আছে বিপুল সম্ভাবনার এ খাতটি। বাংলাদেশ থেকে ইতালি, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর চামড়াজাত পণ্য রফতানি করা হয়। তাছাড়া কোরবানির সময় চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত-করণে প্রায় হাজার কোটি টাকার ব্যবসা জড়িত। লবণ হলো চামড়া সংরক্ষণের অন্যতম উপাদান। জানা যায় দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত লবণের মজুদ রয়েছে। কোরবানির ঈদে চামড়া শিল্পের জন্য লবণের সংকট হবে না। কোরবানি উপলক্ষ্যে লবণের ব্যবসাও চাঙ্গা হয়। চামড়া সংরক্ষণে প্রয়োজন হয় বিপুল জনবলের। এসময় শ্রমিকরা পান তাদের শ্রমের চড়ামূল্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণেও লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কোরবানির বর্জ্যেও অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনার কথা বলছেন গবেষ-করা। অন্যদিকে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার বিপুল সম্ভাবনার উৎস এই কোরবানির ঈদকে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। মন্ত্রণালয় বলেছেন, দেশে চাহিদার চেয়ে বেশি গবাদি পশু থাকায় চলতি বছরে কোরবানি ঈদের জন্য পশু আমদানি করা হবে না। অবৈধ পথে কোনোভাবেই গবাদি পশু প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এমনকি কোরবানি শুরুর একমাস আগে (৪ মে)

থেকেই গবাদি পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ আছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। কোরবানির ঈদে বাজার যেন কেউ অস্থিতিশীল করতে না পারে, চাঁদাবাজির কারণে পশুর দাম যেন না বাড়ে সেজন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করেছে এ মন্ত্রণালয়। এছাড়া গবাদিপশুর মধ্যে স্টেরয়েড ও হরমোন ব্যবহার রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জন্য সারাদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন বিষয়ে ৮৩ হাজার ৬৫৬ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ, ৬ হাজার ৬০০টি উঠান বৈঠক, ২ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৮টি জনসচেতানামূলক লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া স্টেরয়েড ও হরমোন ব্যবহার রোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে খামারিদের প্রশিক্ষণ চলমান আছে এবং জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে ৫৩ হাজার ২৬৩টি খামার পরিদর্শন করে খামারিদের স্টেরয়েড/ হরমোন এর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া এবারও কোরবানির পশু পরিবহনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এবার বাসে বা পরিবহনের লকাপে কেউ যেন ছাগল ও ভেড়া পরিবহন না করে সে বিষয়ে সচেতনতাসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে। প্রাণিকল্যাণ আইন ২০১৯ অনুযায়ী কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ পরিহার করতে হবে এবং যথাযথ পরিবহনের মাধ্যমে পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। তা ব্যত্যয় হলে প্রাণিকল্যাণ আইন ২০১৯ অনুযায়ী হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোরবানির পশুবাহী ট্রাক ছিনতাই রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পশু পরিবহন নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (বিজিবি এবং বাংলাদেশ পুলিশ), জেলা প্রশাসন, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে বলেও জানা যায় মন্ত্রণালয় সূত্রে। এবার এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (হট লাইন-১৬৩৫৮) চালু থাকবে। যেকোনো সমস্যা সমাধানে ফোন করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহাসড়কে বা যেখানে হাট বসালে যান চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কিছু যাতে না হয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হবে। জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সাথে একযোগে কাজ করবে। সড়কে বা সেতুতে কোরবানির পশুবাহী গাড়িকে প্রাধান্য দেওয়াসহ যাতে রাস্তায় পশু আটকে কৃত্রিম যানজট সৃষ্টি না করা হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোরবানির পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম চিকিৎসা দিবে ও মনিটরিং করবে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার উদ্যোগে প্রতিটি হাটে উপযুক্ত ও নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের ক্যাম্প স্থাপন করাসহ দায়িত্ব পালনকালীন প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট থাকবে। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সেবা কর্মীদের জন্য অ্যাপ্রোন, মাস্ক, চেয়ার-টেবিল, বালতি ও মগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে। গত বছরের মতো এবারও ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৯টি পশুর হাটে পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে ২০টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য ৫টি কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২টি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমন্বয়, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, কন্ট্রোল রুম পরিচালনাসহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক টিম গঠন করা হবে। তাছাড়া সারাদেশে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম প্রাথমিক চিকিৎসা পরামর্শ, কোরবানির পশু নিরাপদ ও কোরবানি উপযোগী কিনা, কোরবানির পশু চেনার উপায়, সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকবে। এ বছর সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) এর মাধ্যমে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর বিশেষ ভেটেরিনারি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম ঢাকা শহরে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মনিটরিং টিম সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। এছাড়া BTV ও BTV World এর পাশাপাশি সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অনুমোদিত সতর্কীকরণ বার্তা টিভিসি, জিঙ্গেল, ডকুমেন্টারি, টকশো ও স্ক্রল আকারে প্রচারের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ লিফলেট, ফোল্ডার ও পোস্টার বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মন্ত্রণালয়ের প্রচার সেল হিসাবে খ্যাত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, এবার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ বিষয়ে ১৫ হাজার ৩৬৯ জন পেশাদার ও ২১ হাজার ২০৮ জন অপেশাদার মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে গবাদিপশুর অনুপ্রবেশ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্তঃসীমান্তবর্তী জেলাসমূহে গবাদিপশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিজিবি, বাংলাদেশ পুলিশ, কোস্ট গার্ড, জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সমন্বিতভাবে কাজ করবে। রবিবার (৪ মে ২০২৫) পর থেকে গবাদি পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোরভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষকরে এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশু সরবরাহের জন্য থাকছে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা। এছাড়া ট্রেন ও নৌ-পথে পশু সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রাণিকল্যাণ আইন ২০১৯ মেনে চলতে হবে। গবাদি পশুর হাটে পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ সহযোগিতায় গবাদি পশুর হাটে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সর্বোপরি, সরকারের নানামুখী উদ্যোগে বাংলাদেশ এখন গরু-ছাগল তথা মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এতে করে দেশের গবাদিপশু দিয়েই দেশের কোরবানির চাহিদা একদিকে যেমন মেটানো যাচ্ছে অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকাও সচল হচ্ছে।

লেখক: **কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম,** গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ভাসমান খাঁচায় কোরাল চাষে সফলতা

দেশে প্রথমবারের মতো ভাসমান খাঁচায় কোরাল বা ভেটকি মাছ চাষে সফলতা পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। গবেষকেরা বলছেন, দেশে কোরাল চাষের বড় বাধা ছিল উপযুক্ত পোনা ও কৃত্রিম খাদ্যের অভাব। কিন্তু সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করে 'রাক্ষসী' প্রকৃতির এই সামুদ্রিক মাছ চাষে সফল হয়েছেন তাঁরা, যা উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য টেকসই আয়ের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে গবেষণার তথ্য জানান এই গবেষণার প্রধান গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক মো. শাহজাহান। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সাসটেইনেবল কোস্টাল মেরিন ফিশারিজ (এসসিএমএফপি) প্রকল্পের আওতায় এই গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী জাবেদ হাসান। গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধান গবেষক জানান, প্রথমবারের মতো ভাসমান খাঁচায় সামুদ্রিক ভেটকি মাছ চাষ ও সম্পূরক কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহারের কার্যকারিতা যাচাই করা ছিল গবেষণার মূল লক্ষ্য। গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয় সাতক্ষীরার শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জ, কক্সবাজারের মহেশখালী ও ভোলার চর কুকরি-মুকরির উপকূলীয় অঞ্চল। মাছ চাষের খাঁচা তৈরি থেকে শুরু করে চাষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে এসব অঞ্চলের স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে শুধু চাষের প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়েনি, দক্ষতাও তৈরি হয়েছে। গবেষক জানান, গবেষণার আওতায় মাছ চাষ শুরু হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে, শেষ হয়েছে একই বছরের ডিসেম্বর। তবে গোটা প্রকল্পের কাজ শেষ করতে লেগেছে দেড় বছরের মতো। গবেষকেরা জানান, জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নার্সিং পর্যায়ে আলাদা জায়গায় মাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। পরে খাঁচায় স্থানান্তর করে পূর্ণাঙ্গ চাষ শুরু হয়। প্রতিটি বৃত্তাকার খাঁচার ব্যাস ৬ দশমিক ৭ মিটার। ৬০ ঘনমিটারের এই খাঁচায় প্রতি ঘনমিটারে ১৫টি করে পোনা ছাড়া হয়। দেশে বাণিজ্যিকভাবে কোরাল পোনা উৎপাদিত হয় না। তাই গবেষণার জন্য থাইল্যান্ড থেকে পোনা আনতে হয়েছে। গবেষক জানান, 'রাক্ষসী' প্রকৃতির এই মাছকে শুরুতে খাওয়ানো হয়েছে কুচি করা তেলাপিয়া মাছ। ধীরে ধীরে খাদ্য ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্যিক কৃত্রিম খাবার (৪৫ শতাংশ আমিষ)। আর শেষে ব্যবহৃত হয়েছে গবেষণাগারে প্রস্তুত ৩৭ শতাংশ আমিষযুক্ত সম্পূরক খাদ্য। কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহারের পরও মাছের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে। মাছের পুষ্টিগুণেও কোনো নেতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়নি। গবেষকেরা মাছের পাকস্থলী পরীক্ষা করে মাছের খাদ্য গ্রহণ ও রূপান্তরের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেন। এতে নিশ্চিত হওয়া গেছে, খাঁচায় চাষের ফলে পুষ্টিমানে কোনো ঘাটতি হয়নি। গবেষক আরও জানান, প্রতিটি খাঁচায় ৮০০ থেকে ৮৫০ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। প্রতি ঘনমিটারে (খাঁচার গভীরতা দেড় মিটার ধরে) উৎপাদন হয়েছে ১৩ থেকে ১৭ কেজি; যা প্রতি হেক্টরে হিসাব করলে ২০ হাজার কেজি থেকেও বেশি হয়। অন্যদিকে পুকুর বা ঘেরে প্রচলিত পদ্ধতিতে গড়ে প্রতি হেক্টরে উৎপাদিত হয় ৬০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ কেজি। খাঁচায় চাষ করা মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে গড় আমিষের পরিমাণ ১৯ গ্রাম, যেখানে প্রচলিত কোরালে এই পরিমাণ ১৭ গ্রাম। গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগে গড়ে ১ টাকা ৭০ পয়সা পর্যন্ত আয় সম্ভব। প্রতিটি খাঁচা নির্মাণে খরচ হয়েছে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা, যেটি প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য। এককে খাঁচায় একবারে ১ হাজার কেজি পর্যন্ত মাছ চাষ সম্ভব। বর্তমানে প্লাস্টিক দিয়ে খাঁচা তৈরি করা হলেও প্রান্তিক মৎস্যচাষিরা চাইলে বাঁশ বা সাধারণ জাল দিয়েও এটি তৈরি করতে পারবেন। এতে করে খরচ আরও কমানো সম্ভব। অধ্যাপক মো. শাহজাহান বলেন, 'এই চাষপদ্ধতিতে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কম, প্রাকৃতিক দুর্যোগেও কম ক্ষতি হয় এবং মাছ একে অপরকে খেয়ে ফেলার আশঙ্কাও থাকে না। প্রতি লিটার পানিতে ৩৫ মিলিগ্রাম লবণাক্ততা পর্যন্ত এই মাছ সহজে বেঁচে থাকতে পারে। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২৫)

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি
দেশি মাছে দেশ ভরি"

কপোতাক্ষের পাড়ে ইউরোপীয় কায়দায় কাঁকড়া চাষ রপ্তানি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়

যশোরের কেশবপুরের আবদুল্লাহ আল মামুন (৩৪) ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে স্নাতক শেষ করে ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। মাস শেষে ভালো বেতন পেতেন। কিন্তু চাকরির বন্দিজীবন ভালো লাগেনি তাঁর। তাই চাকরি ছেড়ে উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা। কেশবপুরের ব্যাসডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মামুনের খামার গড়ে উঠেছে সাগরদাঁড়িতে কপোতাক্ষ নদের তীরে। নাম অ্যাকুয়া ক্র্যাব। এখানে বাগদা, গলদা ও ভেনামি চিংড়ির পাশাপাশি কাঁকড়ার চাষ করছেন তিনি। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত দুই কোটি টাকার মতো খরচ করেছেন তিনি। এরই মধ্যে ৫০ লাখ টাকা উঠে এসেছে। গত বছর প্রকল্প থেকে ২০ লাখ টাকার মতো লাভ হয়েছে। সময় যত বাড়বে, এই আয় তত বাড়বে বলে আশা করেন তিনি। ২০১৮ সালে চাকরি ছেড়ে দেন আবদুল্লাহ আল মামুন। পরে চট্টগ্রামের ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাৎস্যবিজ্ঞানে একটি কোর্স করেন। তিনি বলেন, ‘আমি নিজে কিছু করতে চেয়েছিলাম। এরপর কুমিল্লায় এক বন্ধুর সঙ্গে চিংড়ি চাষ শুরু করেন মামুন। সেখানে একদিন জালে ধরা পড়ে দুটি কাঁকড়া। সেগুলো বিক্রি করে তাঁর মনে হয়, চিংড়ির চেয়ে কাঁকড়া চাষে লাভ বেশি হতে পারে। পরের বছর মহাখালীর বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টারে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিজয়ী হন তিনি। পুরস্কার হিসেবে ২৩ লাখ টাকা পান। সেটিই হয় তাঁর প্রাথমিক পুঁজি। লোনাপানিতে কাঁকড়া ভালো হয় বলে কপোতাক্ষ নদ-ঘেঁষা পাঁচ বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন খামার। ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসে যেভাবে কাঁকড়ার চাষ হয়, সেটি অনুসরণ করেন তিনি। বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা পরিষদ থেকে তিনি এই পদ্ধতি সম্পর্কে শেখেন। এখন এটি একটি লাভজনক খামারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আবদুল্লাহ আল মামুন সজীবের খামারে ৭৩ হাজার বক্সে সমানসংখ্যক কাঁকড়া আছে। সম্প্রতি মামুনের খামারে গিয়ে দেখা যায়, কাঠের সেতুর পাশের জমিতে বদ্ধ লোনাপানিতে চলছে কাঁকড়া ও চিংড়ির চাষ। কাঠের বক্সে প্রতিটি কাঁকড়া আলাদা করে চাষ করা হচ্ছে। একটি কাঁকড়া আনার ২৫-৩৫ দিনের মধ্যে খোলস পাল্টে নরম খোলসের কাঁকড়ায় পরিণত হয়। তখনই এটি বিক্রির উপযোগী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এখানে দুই ধরনের কাঁকড়া চাষ করে নরম খোলসের ও শক্ত খোলসের। বিদেশে নরম খোলসের কাঁকড়ার বেশি চাহিদা। কারণ, এটি পুরোটা খাওয়া যায়।’ বর্তমানে তাঁর খামারে ৭৩ হাজার বক্সে কাঁকড়া আছে বলে তিনি জানান। ১৭টি গ্রেডের নরম খোলসের কাঁকড়া গ্রেড ভেদে প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হয় জানিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই কাঁকড়া সুন্দরবন উপকূলের বিভিন্ন নদী থেকে সংগ্রহ করেন ৫২০ টাকা কেজি দরে। খাদ্য হিসেবে কাঁকড়াকে দেওয়া হয় তেলাপিয়া মাছ। অবশিষ্ট অংশ চিংড়ি খেয়ে নেয়। এভাবে একই জলাশয়ে কাঁকড়া ও চিংড়ি একসঙ্গে বেড়ে ওঠে। নরম খোলসের কাঁকড়া বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চীনে রপ্তানি করছেন। কাঁকড়া ধরে কোল্ডস্টোরেজে রেখে প্যাকেট করে বিদেশে পাঠানো হয়। শিগগিরই কাঁকড়ার রেডি ফুড প্যাকেটজাত করে বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। আব্দুল্লাহ আল মামুনের চাষ করা কাঁকড়া রপ্তানি হয় অস্ট্রেলিয়ায়। যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়িতে আব্দুল্লাহ আল মামুনের চাষ করা কাঁকড়া রপ্তানি হয় অস্ট্রেলিয়ায়। রপ্তানির জন্য কাঁকড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, খামারের বক্স থেকে নরম খোলসের কাঁকড়া তুলে মিঠাপানিতে রাখা হয়, যাতে লবণাক্ততা না থাকে। এরপর ৪০ মিনিট অক্সিজেন দেওয়া হয়। এরপর পুনরায় মিঠাপানিতে ধোয়া, ওজন গ্যাস দেওয়া, ক্লোরিন দ্রবণে ভেজানো এবং আইসবাথ করানোর পর কাঁকড়া প্যাকেটে ঢোকানো হয়। এসব কাঁকড়া সাতক্ষীরার মৌতলা এলাকায় পাঠিয়ে সেখান থেকে বায়ারের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। আবদুল্লাহ আল মামুনের ভাষায়, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য নিজের লাভের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। তিন বছর আগে খামারে শ্রমিক ছিলেন ৮ জন, এখন কাজ করছেন ২২ জন। ভবিষ্যতে খামারে দুই লাখ কাঁকড়া চাষ করার লক্ষ্য তাঁর। এতে আরও বেশি মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। কেশবপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাস বলেন, তিনি প্রকল্পটি দেখেছেন। প্রকল্পটি অনেক লাভজনক, কর্মসংস্থানও বেশি হচ্ছে। সে কারণে বলা যায়, এটি ভালো প্রকল্প। এটি যেহেতু লাভজনক প্রকল্প, তাই অনেকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত হতে পারেন। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২৫)

“কাঁকড়া চিংড়ির সমন্বিত চাষে কর্মসংস্থান-অর্থ দুই ই মিলে”

দেশি মুরগি পালনে মাসে লাখ টাকা আয় পুতুলের

শুরুটা শখের বশে। তা-ও একটি মাত্র দেশি মুরগির বাচ্চা দিয়ে। একপর্যায়ে সেই মুরগি থেকে কিছু মুরগি হলে ছোট্ট পরিসরে গড়ে তোলেন খামার। তবে তার সাফল্য ধরা দেয় ইউটিউবে এক নারী উদ্যোক্তার দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালনের ভিডিও দেখে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম করে আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন বিশাল দেশি মুরগির খামার। এ খামার থেকে পুতুলের মাসে আয় অন্তত লাখ টাকা। মুরগি বিক্রির টাকা দিয়ে গড়েছেন শখের বাড়ি। তার এ সাফল্যের অংশীদার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি। সব সময় তাকে সহযোগিতা করে চলেছেন তারা। জানা যায়, শরীয়তপুর সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বালিয়াকান্দির মালয়েশিয়া প্রবাসী মনির হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী পুতুল আক্তার। চার বছর আগে তিনি মায়ের বাড়ি থেকে শখের বশে একটি দেশি মুরগির বাচ্চা কিনে আনেন। পরে মুরগিটি বড় হয়ে ডিম দেওয়া শুরু করলে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোঁটান তিনি। মুরগির বাচ্চাগুলো শিয়ালে নিয়ে যাওয়া শুরু করলে শ্বশুর মোড়ল চৌধুরি একটি ছোট্ট ঘর তুলে দেন মুরগি লালন-পালনের জন্য। একদিন ইউটিউবে একটি ভিডিও সামনে আসে। যেখানে এক অনার্স পড়ুয়া দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে পুতুলকে। মনে মনে সংকল্প করেন, তিনিও গড়ে তুলবেন দেশীয় প্রজাতির মুরগির খামার। তার ইচ্ছাশক্তি আর অদম্য সাহস দেখে অনুপ্রেরণা জোগান স্বামী মনির হোসেন চৌধুরী। স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণ করে দেন একটি বড় খামার। এরপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মাঝখানে কিছু মুরগির বাচ্চা মারা গেলেও পরে ডা. থেকে পরামর্শ নিয়ে পুরো উদ্যমে পালন করতে থাকেন দেশীয় প্রজাতির মুরগি। বর্তমানে তার খামারে আছে অন্তত ১ হাজার মুরগি। এ খামার থেকে তিনি মুরগির বাচ্চা, ডিম আর বড় মুরগি বিক্রি করে মাসে আয় করেন অন্তত লাখ টাকা। যা দিয়ে তিনি স্বামীকে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি নির্মাণেও সহযোগিতা করছেন। পুতুল আক্তার জানান, তার খামারে আছে ৩৫০টি প্যারেন্টস মুরগি। প্রতি ৯টি মুরগির জন্য আছে একটি করে মোরগ। প্রতিদিন তার খামার থেকে গড়ে সংগ্রহ করেন ১৬০টি ডিম। এ ডিম থেকে প্রতি সপ্তাহে ৪০০ ডিম বসানো হয় বাচ্চা ফোঁটানোর জন্য। বাকি ডিম বিক্রি হয় খাওয়া ও বীজ ডিম হিসাবে। খামারের ডিমগুলো থেকে বাচ্চা ফোটানোর জন্য আছে দুটি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিন। এ মেশিনের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে তিনি ৩৫০টি বাচ্চা মুরগি ফুটিয়ে নিজ জেলাসহ আশপাশের জেলায় বিক্রি করেন। তার খামারের একদিনের বাচ্চা ৬০ টাকা ও ২১ দিনের বাচ্চা ১০০ টাকা বিক্রি করেন। ডিম বিক্রি করেন ৮০ টাকা হালি। তার দেখাদেখি অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন দেশি মুরগি পালনে। অনেকে আবার শুরু করেছেন ছোট্ট পরিসরে। এমন পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হওয়ায় খুশি পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরাও। পুতুল আক্তার বলেন, 'আমি সব সময় চাইতাম স্বাবলম্বী হতে। ছোট থেকে শুরু করে একটি বড় খামারের মালিক হয়েছি। শুরু থেকেই স্বামী আমার পাশে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই আমার খামার দেখাশোনা করেন। আমি মনে করি, প্রত্যেক নারী চাইলে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'একটি মুরগি দিয়ে শুরু করে এখন বড় একটি খামারের মালিক পুতুল আক্তার। তিনি ডিম, বাচ্চা এবং বড় মুরগি বিক্রি করে মাসে লাখ টাকা আয় করেন। সেই টাকা দিয়ে একটি ঘরও তৈরি করেছেন। আমরা সব সময় পুতুল আক্তারের পাশে আছি। পুতুল আক্তারের মতো যারা খামার দিতে চান; তাদেরও প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা দেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। (সূত্র : জাগো নিউজ২৪.কম, ২২ মে ২০২৫)

কাপ্তাই লেক দেশের সম্পদ, এটাকে রক্ষা করতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, কাপ্তাই লেক দেশের সম্পদ, এই লেককে রক্ষা করতে হবে। এ জন্য সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উপদেষ্টা সোমবার (১২ মে ২০২৫) সকালে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রের আয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) মৎস্য অবতরণ ঘাটে। কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্তকরণ ও মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, “মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে কেউ যেন মাছ না ধরতে পারে, সে জন্য নজরদারি বাড়ানো হবে। কিছু অসাধু জেলে ও ব্যবসায়ীরা নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করে, সেটি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া বন্ধের সময় ভিজিএফের আওতায় চালের পরিমাণ ২০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৪০ কেজি করা হবে। মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, কাপ্তাই লেকে এক সময় ৮৬ প্রজাতির নানা রকমের মাছ থাকলেও বর্তমানে তা কমে ৬৬ প্রজাতির মধ্যে চলে এসেছে। তাই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৎস্য ব্যবসায়ীসহ জেলেদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, কাপ্তাই হ্রদে যে সমস্ত পর্যটক ঘুরে বেড়ান তারা বিভিন্নভাবে হ্রদে দূষণ করেন। জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলে ট্যুরিস্টদের সচেতন করতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, কাপ্তাই লেকের মাধ্যমে হাজার হাজার জেলে পরিবার, সাধারণ ব্যবসায়ীসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি লেককে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী জেলেসহ সকলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়। তিনি আরও বলেন, কাপ্তাই হ্রদে উৎপাদিত মাছ দিয়ে ব্যবসা করলে হবে না; মাছের প্রজনন বৃদ্ধি কীভাবে বাড়ানো যায় সেটার জন্য কাজ করতে হবে। সেজন্য মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করে তাহলে মানুষের উন্নতি এবং গবেষণা কাজ করা সহজ হবে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সুরাইয়া আখতার জাহানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. তোফাজ্জেল হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব:) অনুপ কুমার চাকমা, রাঙ্গামাটি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রতিবছর কার্পজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য কাপ্তাই হ্রদে তিন মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদ থেকে প্রায় ৯ হাজার মেট্রিক টন মাছ আহরণ করে প্রায় ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। পরে উপদেষ্টা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী উপকেন্দ্র রাঙ্গামাটি পরিদর্শন এবং মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি বলেন, বিএফআরআই এর মূল কাজ হলো হারিয়ে যাওয়া মাছ পুনরুদ্ধারে কাজ করা ; আর এক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের আরও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান**, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

ভেড়া পালনে ভাগ্যবদল রংপুরের তিন শতাধিক নারীর

অভাবের সংসারে দুবেলার খাবার জুটত না। প্রতিদিনই ঝগড়া লেগে থাকত। প্রায় দিনই থাকতে হতো উপোস। এ অবস্থায় প্রতিবেশী এসমোতারা বেগমের কাছ থেকে এক হাজার টাকায় একটি ভেড়া কিনে পালন শুরু করেন বেবি বেগম। এটা ২০১৩ সালের কথা। গত ১০ বছরে ভেড়ার পালন করে নিজের সংসারে অভাব দূর করেছেন। দেড় শতাধিক ভেড়া বিক্রি করে সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন, আয় করেছেন প্রায় পাঁচ লাখ টাকা। শুধু নিজের ভাগ্য বদল করে থেমে থাকেননি, প্রতিবেশী ও আশপাশের গ্রামের অভাবী নারীদেরও পথ দেখিয়েছেন বেবি। সংগ্রামী এই নারী খামারির বাড়ি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের প্রামাণিকপাড়া গ্রামে। এই গ্রামসহ আশপাশের পাঁচটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৩০০ নারী এখন ভেড়া পালন করছেন। বেবির দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁদের প্রত্যেকে এখন বাড়িতে ভেড়ার খামার গড়ে তুলেছেন। তারাগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে প্রামাণিকপাড়া গ্রাম। বেবি বেগমের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি ভেড়াকে পাতা খাওয়াচ্ছেন। সেখানে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। বেবি বেগম বলেন, বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এসে দেখেন অভাব আর অভাব। থাকার আশ্রয়টুকুও জরাজীর্ণ। স্বামী জুয়ায় আসক্ত হলে অভাব আরও প্রকট হয়। প্রায়ই অনাহারে থাকতে হতো। অভাবের কারণে প্রায় অন্যের খেত খামারে, বাড়িতে কাজে যেতেন বেবি বেগম। সেই কাজে উপার্জিত টাকা জমিয়ে ১ হাজার টাকা দিয়ে ২০১৩ সালের মার্চে প্রতিবেশী এসমোতারার কাছ থেকে একটি ভেড়া কিনে পালন শুরু করেন। বছর না ঘুরতেই সেই ভেড়া দুই দফায় পাঁচটি বাচ্চা দেয়। তা বিক্রি করে আয় হয় সাত হাজার টাকা। এভাবে একসময় ভেড়ার সংখ্যা বাড়ে, বেবির অভাবের সংসারে ফেরে সচ্ছলতা। গত বছর ২১টি ভেড়া বিক্রি করে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা আয় করেন বেবি। বর্তমানে তাঁর খামারে ২৫টি ভেড়া আছে। লাভের টাকায় টিনের ঘর করেছেন, স্বামীকে কিনে দিয়েছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা (ইজিবাইক)। এক একর জমি বন্ধক নিয়ে করছেন চাষাবাদ। বেবি বেগম বলেন, 'শান্তিতে ঘুমাবার জায়গা আছলো না। একসময় খুব কষ্টে খায়া না খায়া দিন গেইছে। এখন দুইবেলা খায়াপরি ভালোভাবে চলবার পারুছি। ভেড়া পুষি মোর সংসারোত ভালোয় উন্নতি হইছে'। বেবি বেগমের ভাগ্যের পরিবর্তন দেখে প্রতিবেশী নারীরাও ভেড়া পালনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বেবি তাঁদের ভেড়া পালনের পরামর্শও দেন। ধীরে ধীরে ইকরচালী ইউনিয়নের প্রামাণিকপাড়া, ছুট মেনানগর, জুম্মাপাড়া, লক্ষ্মীপুর মণ্ডলপাড়া, দোহাজারীর প্রায় ৩০০ নারী ভেড়া পালনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ফজলুল করিম বলেন, উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে সবচেয়ে বেশি ভেড়া পালন করা হচ্ছে। বেবি বেগম একজন সফল ভেড়ার খামারি। তাঁর মতো উদ্যমী নারীকে দেখে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ভেড়া পালন করছেন। প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁরা ভেড়া পালনকারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

"করলে ভেড়া লালন-পালন দেশের হবে উন্নয়ন"

পার্বতীপুরে ট্যাংকে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী গ্রামের মানুষ

৯৬টি ট্যাংকে হচ্ছে মাছ চাষ। সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এ পদ্ধতির নাম খরাপ্রবণ এলাকায় 'ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ'। প্রতিটি ট্যাংকের উচ্চতা প্রায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ ফুট। ২০ হাজার লিটার পানি ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ ট্যাংক। ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন পার্বতীপুর উপজেলার পল্লী এলাকার অনেক মানুষ। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটি অনেক বেশি লাভজনক। তাই বাড়ির উঠানে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফলতা অর্জন করেছেন অনেক মৎস্য চাষি। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন চন্ডিপুর, হাবড়া, মোমিনপুর, পলাশবাড়ী ও একটি পৌরসভাসহ ১৫ গ্রামের ৯৬টি ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষের ফলে সহস্রাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে মৎস্য বিভাগের পাশাপাশি উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করছে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন নামে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সরেজমিনে দেখা মিলল পার্বতীপুর উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের মশিম ম্যাড়েয়া গ্রামে। জিয়াউর রহমান জিয়া ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ বাড়ির উঠোনেই চাষ করছেন। তার এসব ট্যাংকে কই, তেলাপিয়া, শিং ও মাগুর মাছ চাষ করা হচ্ছে তিনি বলেন, এ মাছ চাষ করে শুধু তার পরিবারের সচ্ছলতা নয়, পরিবারের সদস্য এবং এলাকার অনেক মানুষের মিটছে আমিষের চাহিদা। মাছগুলো ধরাও অনেক সহজ, একদম হাতের নাগালে। স্বল্প সময়ের মধ্যে চাহিদা মাফিক মাছ তুলে দেওয়া হয়। এতে বাড়তি আয় হচ্ছে। শুধু জিয়াউর নয়, একই পদ্ধতিতে মোমনিপুর ইউনিয়নের হয়বৎপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম, পলাশবাড়ী ইউনিয়নের কালাইঘাটি গ্রামের সোহাগ আলী অনেকেই করছেন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে প্রচুর পরিমাণ লাভ দেখতে পাচ্ছেন। পার্বতীপুর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের হয়বৎপুর গ্রামের নারী উদ্যোক্তা খাদিজা বেগম নিজ জমিতে পানির ট্যাংকে মাছ চাষ শুরু করেছেন। পেশায় তিনি একজন গৃহিণী হলেও অন্যান্য নারীদের স্বাবলম্বী করতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। ট্যাংকে মাছ চাষের সফলতা নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। তিন বছর আগে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় গড়ে তুলেছেন। 'খাদিজা ফিশ ফার্ম'। নারী উদ্যোক্তারা তার এ ফার্ম দেখতে দূরদূরান্ত থেকে অনেকে ছুটে আসেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ২টি ট্যাংকে মাছ চাষ শুরু করেছেন। ২০ হাজার লিটার পানি ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রতিটা ট্যাংকে প্রায় ৫ হাজার পিস মাছ উৎপাদন করছেন। তার এসব ট্যাংকে কই, শিং, তেলাপিয়া ও মাগুর মাছ চাষ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে বছরে দুই থেকে তিন বার মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। যার ফলে অল্প সময়ে অধিক লাভবান হওয়া যায়। খাদিজা বেগম আরও বলেন, গ্রামে কারও বাড়িতে মেহমান বেড়াতে এলে আমাদের থেকে মাছ নিতে আসেন প্রতিবেশীরা। ৩-৪ মাস পর প্রতিটি ট্যাংক থেকে ৪শ' থেকে ৫শ' গ্রাম ওজনের মাছ উৎপাদন হয়। প্রতি কেজি মাছ বিক্রি ২০০-৩০০ টাকা। আর কেজিতে ১০ থেকে ১২টি শিং মাছ বিক্রি হয়। চিরির বন্দর থেকে দেখতে আসা আরেক নারী উদ্যোক্তা পলি বেগম (৩০) বলেন, খাদিজা আপার পানির ট্যাংকে মাছ চাষ দেখার জন্য আমি শিমুলতলী থেকে দেখতে এসেছি। এতদিন জানতাম পুকুরে মাছ তো এখন দেখি ট্যাংকে। আমি আগামীতে ট্যাংকে মাছ চাষ করবো। পার্বতীপুর পৌরসভার সাগর হল এলাকার তরুণ উদ্যোক্তা রাজু আহমেদ ভাড়া নেওয়া জমিতে ট্যাংক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেছেন। পেশায় তিনি একজন পল্লী চিকিৎসক। চার বছর আগে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় গড়ে তুলেছেন পার্বতীপুর অ্যাগ্রো ফার্ম ফিশারিজ। তার তিনটা ১০ হাজার লিটার পানি ও ৩০ হাজার লিটার পানি ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ ট্যাংক রয়েছে। প্রতিটা ট্যাংকে প্রায় ৫-৭ হাজার পিস মাছ উৎপাদন করছেন।

তার এসব ট্যাংকে ভিয়েতনাম কই, শিং, তেলাপিয়া ও মাগুর মাছ চাষ করা হচ্ছে। এছাড়া মাছের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য অবশ্য সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের সুব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের (জিবিকে)'র মৎস্য কর্মকর্তা মো. জাহেদুল হক জানান, এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে যেখানে খাদ্য খরচ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম। মাছের উৎপাদন হার পুকুর বা জলাশয়ের চেয়ে অনেক বেশি। এ পদ্ধতিতে চাষের ফলে মাছ দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছের গুণগত মান উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং মাছের মৃত্যুহার নেই বললেই চলে। পার্বতীপুর সিনিয়র উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা আবু জাফর মো. সায়েম জানান, উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় এখন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ হচ্ছে। অনেকের পুকুর নেই, পুকুরের পানিও থাকে না। অল্প পানির ট্যাংকে মাছ চাষ করা যায়। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পার্বতীপুরে ট্যাংক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। (সূত্র : বাংলানিউজ২৪.কম, ২৩ মে ২০২৫)

'পোলট্রি পল্লি' গ্রামের বাড়িগুলো যেন একেকটি খামার

সফল খামারি হয়ে থেমে যাননি আরিফুল ইসলাম। তরুণ যুবাদের পরামর্শ দিয়ে 'উদ্যোক্তা তৈরির কারিগর' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ৩৯ বছর বয়সী আরিফুল ইসলাম সফল পোলট্রি খামারি হয়ে কেবল নিজের স্বপ্ন পূরণ করেই থামেননি, তরুণ/যুবাদের অনুপ্রেরণা-পরামর্শ দিয়ে রীতিমতো 'উদ্যোক্তা তৈরির কারিগর' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। আরিফুলের বাড়ি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে। নিজের আয়ে গ্রামেই করেছেন ডুপ্লেক্স বাড়ি। উদ্যোক্তা গড়তে তিনি নারী পুরুষদের বিনা মূল্যে দিচ্ছেন প্রশিক্ষণ। আরিফুলের চেষ্টায় স্থানীয় দুই শতাধিক মানুষ মুরগির খামার গড়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আরিফুলের কল্যাণে এই গ্রামকে এখন 'পোলট্রি পল্লি' নামে চেনে লোকে। আরিফুলের বাড়িতে ঢোকার রাস্তার দুই পাশে সারি সারি গাছ। আরিফুল তখন গ্রামের নারী-পুরুষদের মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে চার একর জমিতে গড়ে তোলা মাছ, মুরগি ও গাভির খামার ঘুরিয়ে দেখান আরিফুল। এর ফাঁকে ফাঁকে নিজের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প শোনালেন। তারাগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে নিভৃত এক গ্রাম হাজীপুর। কাঁচা-পাকা পথ ধরে আরিফুল ইসলামের বাড়ি যাওয়ার সময় একের পর এক খামার চোখে পড়ে। প্রতিটি বাড়ির আনাচে-কানাচে সবজি চাষ করা হয়েছে। উঠানেও হাঁস-মুরগি, গোয়ালে গরু-ছাগল-ভেড়া। ঘরের চালা, আঙিনাজুড়ে চোখে পড়ে বিভিন্ন জাতের কবুতর। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি যেন ছোট-বড় একেকটি খামার। এর ফাঁকে ফাঁকে নিজের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প শোনালেন আরিফুল। ডিম বিক্রির লাভের টাকায় আরিফুল আরও এক হাজার মুরগি আনেন খামারে। এভাবে একপর্যায়ে আয় বাড়ে, খামার বাড়ে; আরিফুল হয়ে ওঠেন সফল উদ্যোক্তা। আরিফুল বলেন, উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা তাঁকে সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ২০০৬ সালে ডিগ্রি পাসের পর তিনি মিঠাপুকুর উপজেলার শুকানোর হাট গ্রামে আসাদুজ্জামানের খামার দেখতে যান। আসাদুজ্জামান ৫ হাজার মুরগি আর ২০টি গরুর খামার গড়ার গল্প শোনান, যা আরিফুলের ভাবনাকে নাড়া দেয়। ওই বছরের মে মাসে বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে বাড়ির পাশে ঘর তুলে ৫০০ লেয়ার মুরগির বাচ্চা এনে খামার শুরু করেন। ৫ মাসের মধ্যে মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে। এক বছরে ডিম বিক্রি করে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা আয় আসে। ডিম বিক্রির লাভের টাকায় আরিফুল আরও এক হাজার মুরগি আনেন খামারে। এভাবে একপর্যায়ে আয় বাড়ে, খামার বাড়ে; আরিফুল হয়ে ওঠেন সফল উদ্যোক্তা।

এখন তাঁর ৮টি ঘরে ২৫ হাজার লেয়ার মুরগি আছে। ২০ জন শ্রমিক নিয়মিত খামারে কাজ করেন। মুরগির খামার থেকে মাসিক আয় তাঁর চার লাখ টাকা। শুধু মুরগি নয়, আরিফুল দুই একর জমিতে পুকুর খনন করে ১০ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করছেন। এতে তাঁর বার্ষিক আয় হচ্ছে তিন লাখ টাকা। খামারে বিদেশি গাভি রয়েছে ৬টি, দিনে গড়ে ২০ লিটার দুধ পান। গরুর খামার থেকে বছরে আয় হচ্ছে আরও কয়েক লাখ টাকা। সময় পেলে খামারের ডিম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে সব সময় তাঁকে সহযোগিতা করা হয় বলে জানান আরিফুল। এছাড়া তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'লেখাপড়া শেষ করে কেবল চাকরির পরীক্ষার জন্য যে সময় ব্যয় হয়, তা যদি নির্দিষ্ট কোনো কাজে ব্যয় করা যেত, তা হলে চাকরির থেকেও ভালো কিছু করা সম্ভব। শুধু চাকরির আশায় বসে না থেকে নিজে কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন হবে। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০২৫)

মাছের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বা পিজি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের কৌশল

বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ, দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড় রয়েছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল হাওড় এলাকা মৎস্য সম্পদের সূতিকাগার। মাছ সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন করে থাকে, আমাদের দেশের খাল, বিল, নদী, হাওর-বাঁওড়ে এক সময় প্রচুর মাছ প্রজনন করত। মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন করার জন্য যে সকল নিয়ামকের প্রয়োজন দিন দিন নষ্ট হয়ে পড়ার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছের প্রজনন দিন দিন কমতে থাকে। ফলে দিন দিন মাছের প্রাপ্যতা দেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে কমতে থাকে, এমনকি কিছু কিছু মাছ প্রজনন করতে না পারায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করেন, যেখানে মৎস্য হ্যাচারিতে মাছকে হরমোন প্রয়োগ করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের চাষের মাছের প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ পোনা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন করে মৎস্য খামারিদের পোনার চাহিদাপূরণ করা হয়ে থাকে। মৎস্য হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যে হরমোন তার নাম পিজি বা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। দেশে দিন দিন মৎস্য হ্যাচারি শিল্প সম্প্রসারণ ঘটায় পিজির চাহিদা বাড়তে থাকে, প্রতি বছর এ চাহিদাপূরণে আমাদের প্রায় ৮০-৯০ কেজি পিজি আমদানি করতে হয়। প্রতি কেজি পিজির বাজারমূল্য প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ টাকা। মাছের প্রজনন মৌসুমে যে গ্রন্থি গোনাডোট্রপিন নামক হরমোন নিঃসরণ করে তাকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড বা পিজি বলে। মাছের পিজির রং ঈষৎ গোলাপী যার অবস্থান মাছের মস্তিষ্কের ঠিক নিচেই। স্ত্রী বা পুরুষ উভয় প্রকার মাছ থেকেই পিজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, পিজি বছরের যে কোন সময় পরিপক্ক মাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, তবে মাছের প্রজনন মৌসুমে সংগ্রহ করলে উত্তম পিজি পাওয়া যায়।

বাণিজ্যিকভাবে মাছের পিজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশল

সদ্য মৃত মাছ, বরফ দিয়ে সংরক্ষিত বা কোল্ডস্টোর থেকে বের করে বাজারজাত করার যোগ্য মাছ থেকে পিজি সংগ্রহ করা যায়। পিজি সংগ্রহ করার জন্য মাছের মাথার মগজ অপসারণ করতে হয়। বাণিজ্যিকভাবে পিজি সংগ্রহ করার জন্য যারা প্রতিনিয়ত মাছ কাটেন তাদের মাধ্যমে করা যায়। বটিওয়ালারা সাধারণত মাছের মাথা শরীর থেকে আলাদা করার পর দ্বিখন্ডিত করে। পিজি সংগ্রহ করার জন্য মাছের মাথা এমনভাবে দ্বিখন্ডিত করতে হবে যেন একপাশে ৫২% ও অন্য পাশে ৪৮% অংশ থাকে। যে পাশে বড় অংশ সে পাশে মগজ থাকবে আর সেই মগজের নিচ থেকে পিজি সংগ্রহ করার জন্য একটি নিডল বা চামুচাকৃতির সুচ লাগবে যা দিয়ে খুব সাবধানে মগজটিকে আলাদা করে বা একপাশে সরিয়ে নিতে হবে, তারপর নিচের পর্দাটি অতি সতর্কতার সাথে সরিয়ে পিজি সংগ্রহ করতে হবে। পিজি সংগ্রহ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পিজির দানাটির উপর কোন চাপ বা আঘাত না লাগে, সেক্ষেত্রে সুচটির মাথা দিয়ে সাবধানতার সাথে পিজি বের করে সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দেশের মাছ বাজারগুলোতে প্রাপ্ত মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, কালিবাউস, মিরর কার্প, গ্রাস কার্প, মৃগেল, বিগহেড কার্প মাছ হতে পিজি সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে সংগৃহীত পিজি হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যেতে পারে বা পরবর্তীতে ব্যবহার বা বাজারজাতকরণের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। পিজি সংগ্রহ করার সময় কোনো ভাবেই পিজির গায়ে পানি লাগানো যাবে না, পানির সংস্পর্শে আসলে পিজির পচন ও গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। পিজি সংগ্রহ করার পর অতি সাবধানতার সাথে তা অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোন দ্রবণে সংরক্ষণ করতে হয়। ২০-৩০ সিসি মাপের কাঁচের শিশিতে অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোনসহ পিজি দানা সংরক্ষণ করতে হয়, প্রথমবার পিজি দানা রাখার ১২-১৬ ঘণ্টা পর একবার এবং পরবর্তীতে ২৪ ঘণ্টা পর আরেকবার দ্রবণ পরিবর্তন করে পিজি সংরক্ষণ করতে হয়। অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোন দ্রবণ পিজিতে থাকা পানি ও চর্বি শোষণ করে পচন রোধ করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এভাবে দ্রবণে সংরক্ষণ করে পিজি প্রায় ১ বছর থেকে ২ বছর ব্যবহার করা যায়; তবে ফ্রিজিং করলে ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়।

অন্যদিকে পিজিকে ২-৩ মাস পর দ্রবণ থেকে বের করে ৩০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ড্রায়ার ব্যবহার করে শুষ্ককরণ করে কাঁচের কর্কযুক্ত (এয়ারটাইট) শিশিতে সংরক্ষণ করলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা যায়।

মাছের পিজির বাজার ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা

আমাদের দেশে ছোট-বড় সব মিলিয়ে ৯৮৪টি মৎস্য হ্যাচারি রয়েছে (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০২৩)। এসব হ্যাচারিতে প্রতিনিয়ত বাণিজ্যিকভাবে কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করে পোনা উৎপাদন করে দেশের মাছ চাষিদের পোনার জোগান দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল মৎস্য হ্যাচারি আমদানিকৃত পিজির উপর নির্ভর করে টিকে আছে, তাই দেশে উৎপাদিত মৎস্য পিজির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। বাণিজ্যিকভাবে পিজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য সংগৃহীত পিজিকে দানার আকার অনুযায়ী আলাদা গ্রেডিং করে নির্দিষ্ট ভায়ালে লেভেলিং করে বাজারজাত করা সম্ভব, তবে অবশ্যই বাজারজাতকরণের পূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ সনদ ও অনুমতিপত্র লাগবে। প্রতি কেজি পিজির বাজারমূল্য প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ টাকা (আকারভেদে)। পরিশেষে বলা যায়, দেশের মাছ বাজারগুলো থেকে পিজি উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে; যা মৎস্য হ্যাচারি শিল্পে এক নব বিপ্লব আনার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

লেখক: **মো. মাসুদ রানা,** সহকারী অধ্যাপক, ফিশারিজ, একোয়াকালচার অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭।

কক্সবাজারের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হচ্ছে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য স্থানীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারি মৎস্য বাজার আধুনিক ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হচ্ছে। উপদেষ্টা নুনিয়ারছড়ায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারি মৎস্য বাজার আধুনিকায়ন প্রকল্পের নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি জানান, নির্মাণকাজ শেষ হলে এটি হবে জেলার একমাত্র স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মৎস্য অবতরণকেন্দ্র। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সামুদ্রিক মাছে অবতরণ, অপচয় হ্রাস ও মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা জোরদারকরণে স্থাপন করা হচ্ছে এই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারি বাজার। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) সহায়তায় ২৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকখালী নদীর পশ্চিম তীরে ৩ দশমিক ৭০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর কাজ ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিএফডিসির চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান। আরও বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত স্যাইদা শিনিচি, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুর রউফ, বাংলাদেশে জাইকার প্রধান ইচিগুচি টামোহাইদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিজাম উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

দুম্বার খামারে বাদলের ভাগ্যবদল

খামারে দুম্বা পালনে ব্যস্ত রেজাউল করিম বাদল সখের বশে দুম্বা লালনপালন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বরিশালের রেজাউল করিম বাদল। এখন তার খামারে রয়েছে ৭০টি তুর্কি দুম্বা। এসব দুম্বা কোরবানিতে বিক্রি করার কথা জানান তিনি। রেজাউল করিম বরিশাল নগরীর লোহারপোল এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। শখের বশে ২০১৬ সালে খুলনা থেকে তিনটি তুরস্ক প্রজাতির দুম্বা সংগ্রহ করেন রেজাউল করিম। ছয় মাস যেতে না যেতেই বাচ্চা দেওয়া শুরু করে দুম্বাগুলো। ধীরে ধীরে তিনটি থেকে বেড়ে এখন তার খামারে ৭০টি দুম্বা। সদর উপজেলার কর্নকাঠি রেজাউল করিম বাদলের খামার ঘুরে দেখা গেছে, দুম্বার পাশাপাশি শতাধিক ব্ল্যাক বেঙ্গল, তোতাপুরী, ব্রিটল, গুজরাটি ও দেশি বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত মানের ছাগল রয়েছে তার খামারে। ছয় শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব প্রাণীর সেবায় কাজ করছেন। শ্রমিকদের পেছনে মাসে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। দুম্বা ও ছাগলের জন্য তিন বেলা দেশীয় ঘাস, গম, ভুট্টার ও ভুষিসহ মাসে খাবার খরচ মিলিয়ে ব্যয় হচ্ছে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা। রেজাউল করিম বাদল বলেন, 'লালন-পালনের পর তিন মাস পরপর দুম্বা ও ছাগল বিক্রি করে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা আয় হয়। তবে এসব দুম্বা ও ছাগল খাওয়ার জন্য মানুষ কিনছেন না, সবাই পালন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষকরে যারা নিজস্ব বা বাণিজ্যিক খামার গড়ছেন তারা এখান থেকে বাচ্চা নিয়ে যান। তিনি বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের দুম্বা আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে ছাগলের সঙ্গে একই খাবার খাচ্ছে। পাশাপাশি ৬-৮ মাসের মধ্যে বাচ্চা দিচ্ছে। বাচ্চাগুলো এক বছরের মধ্যে প্রায় ৮০ কেজি পর্যন্ত ওজন হওয়ার পর সেটি বিক্রির উপযোগী হয়। এ বিষয়ে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমরা বাদলের খামারটি সার্বক্ষণিক অবজারভেশনে রেখেছি। মরু দেশের এ প্রাণী আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে মিলে গেছে। দুম্বা পালনে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতা করা হবে। (সূত্র : জাগোনিউজ২৪.কম, ৩১ মে ২০২৫)

ইনোভেশন যত বেশি পরস্পর আদান-প্রদান করা যাবে তত বেশি সফল হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ইনোভেশন যত বেশি পরস্পর আদান-প্রদান করা যাবে ইনোভেশন তত বেশি সফল হবে। তিনি আরও বলেন, ইনোভেশনের সুফল পেতে হলে ইনোভেশনকে গ্রামগঞ্জের মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। উপদেষ্টা বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের প্রতি সচেতন করা গেলে দেশ সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য ইনোভেটিভ আইডিয়া মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তিনি সকল দপ্তর সংস্থাকে আগামীতে আরও বেশি সংখ্যক ইনোভেটিভ আইডিয়া প্রদান করার জন্য আহ্বান জানান। উপদেষ্টা আরও বলেন, পান্তা ভাতকে পঁচন থেকে সহজে রোধ করার জন্য পানি দিয়ে ভাত সংরক্ষণ করার আইডিয়া প্রথম নারীদের মাথা থেকেই আসে। এছাড়াও লেবু পাতার মাধ্যমে বাসি মাছকেও যে খাওয়ার উপযোগী করা যায়, সেই আইডিয়াও প্রথম নারীদের মাথা থেকেই আসে।

তাই ইনোভেশন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান তিনি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার দক্ষ জনবলকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে; তাহলে নিজেকে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, দপ্তর সংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে ইনোভেশন নিয়ে কাজ করলে সরকারি সেবা সহজে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক মো. রশিদুল মান্নাফ কবীর। এসময় দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণসহ ইনভেশন টিমের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এবার ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আটটি দপ্তর সংস্থা মোট ৩০টি ইনভেশন নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ১১টি, মৎস্য অধিদপ্তরের ১০টি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা

ইনস্টিটিউটের ৩টি, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ২টি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ১টি এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ১টি ইনোভেশন রয়েছে। উল্লেখ্য, শোকেসিং অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর 'ইজি লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট' নামে একটি ইনোভেশন প্রদর্শন করেন। ইনোভেশনটির উদ্ভাবক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য) মাহবুবা খানম। তিনি ইনোভেশনটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, ইজি লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট একটি অনলাইন ভিত্তিক সেবা। যার মাধ্যমে মৎস্য ও

প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ সহজেই বই সংগ্রহ করে পড়তে পারবেন। এর জন্য সেবা গ্রহীতাকে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের স্টেকহোল্ডারগণ অনলাইনে বিনামূল্যে, বিনা যাতায়াতে ঘরে বসে বই পড়ার সুযোগ পাবেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের লাইব্রেরিতে প্রায় চারশত বই রয়েছে। লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ করার জন্য বই সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

ছোট মাছের বড় পুষ্টিগুণ

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশে অসংখ্য জলাশয় আছে। এসব জলাশয় ছোট-বড় মাছে ভরপুর। মিঠাপানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এগুলোকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। মূলত রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, আইড়, বোয়াল, ইলিশ, পাঙাস, চিতল এগুলো বড় মাছের তালিকায় রয়েছে। মাঝারি আকারের মাছের মধ্যে ফলি, মাগুর, শিং, বেলে, কই, তেলাপিয়া, বাটা ইত্যাদি এবং ছোট মাছের তালিকায় মলা, ঢেলা, বাতাসি, পিয়ালি, কাজলি, পুঁটি, টেংরা, দারকিনা, কাঁচকি, চান্দা, খলিশা, গোচি অন্যতম। আমাদের দেশের জলাশয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ পাওয়া যায়। এরই মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রজাতিরও বেশি ছোট মাছ রয়েছে। এসব ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণ ম্যাক্রো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে। বিভিন্ন ভিটামিন (যেমন-এ, ডি, ই, কে সহ বি কমপ্লেক্স) এবং মিনারেল (যেমন-ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ও আয়োডিন ইত্যাদি এর অন্যতম) সরবরাহকারী এই ছোট মাছ। এসব মাছে বিদ্যমান ভিটামিন ও মিনারেল মানব শরীরের জন্য সহজপাচ্য এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। **ছোট মাছের সার্বিক পুষ্টিগুণ:** ছোট মাছে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান আমিষ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও শক্তিতে ভরপুর। বিভিন্ন ধরনের সমৃদ্ধময় পরিবেশে বসবাস করার কারণে ছোট মাছের মধ্যে সব থেকে বেশি পুষ্টি উপাদান থাকে। এছাড়াও ছোট মাছের প্রায় সব অংশই খাওয়া হয় এজন্য পুষ্টিগুণটা আরও ভালোভাবে পাওয়া যায়। **মানবদেহে ছোট মাছের গুরুত্ব:** পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছ শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। ছোট মাছ মলা, ঢেলা, দারকিনায় পর্যাপ্ত খনিজ ও ভিটামিন (যেমন: আয়রন ও ফলিক এসিড) শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। ছোট মাছ নারী, গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধবতী নারীদের অপুষ্টি প্রতিরোধ করে। এছাড়া মাতৃত্বকালীন, নবজাতক এবং শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ করে এবং স্থায়ী অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পুষ্টিপূরণ করে। **হুমকির মুখে ছোট মাছ:** বর্তমানে দেশীয় ছোট মাছগুলো হুমকির মুখে পড়েছে। ছোট মাছের প্রাচুর্য কমে যাওয়ার নিম্নোক্ত কিছু কারণ উল্লেখযোগ্য: নির্বিচারে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ ধরা; ধ্বংসাত্মক মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহার; অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ; প্লাবনভূমি অঞ্চলের জলাশয়গুলো পলিমাটি দিয়ে ভরাট হওয়া; কৃষি জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার; জলাশয়ে শিল্পকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন; জলাশয়কে কৃষি জমিতে রূপান্তর; মানুষের সচেতনতার অভাব। **ছোট মাছ সংরক্ষণে বিএফআরআই ভূমিকা:** ছোট মাছ সংরক্ষণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) সর্বদা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) বিপন্ন ও দেশী প্রজাতির মাছের ওপর গবেষণা করে ৩৯টি মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ও উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। BFRI কর্তৃক উদ্ভাবিত কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট মাছ বাতাসি, পিয়ালি, ঢেলা, জাত পুঁটি, দারকিনা, খলিশা ও গুলশা প্রভৃতি। এছাড়াও BFRI কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইভ জিন ব্যাংক এ প্রকৃতিতে সংকটাপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে। যাতে প্রকৃতিতে মাছের সংকট দেখা দিলে লাইভ জিন ব্যাংক হতে মাছ নিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাছকে পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ছোট মাছ স্বাদে ও পুষ্টিগুণে অনন্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের খাবারের মূল অংশ হলো মাছ। বাঙালির খাবার টেবিলে ছোট মাছের অনুপস্থিতি মানে পুষ্টিকর খাবারের সরবরাহ কমে যাওয়া। মাছের উৎপাদন কমে যাওয়া মানে অনেকাংশ মানুষের খাদ্যকে প্রভাবিত করা।

লেখক:

১। **ড. ডেভিড রিন্টু দাস,** প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

২। **শাহনাজ পারভিন,** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র সান্তাহার, বগুড়া।

"ছোট মাছের পুষ্টিগুণ ছোট বড় সবার প্রয়োজন"

হাওরে ইজারা বন্ধ করতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

প্রকৃত মৎস্যচাষীদের স্বার্থে হাওরে ইজারা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, কোন হাওরে ইজারা থাকা উচিৎ নয়। হাওর ঐ অঞ্চলের মানুষের অধিকার; আর তা রক্ষা করতে হবে। শনিবার (১৯ এপ্রিল ২০২৫) সকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯: হাওর অঞ্চলে বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনা"-শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। হাওরের মালিককে মূলত প্রশ্ন রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, আসলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হাওরগুলো রয়েছে। যদিও অধিকাংশ হাওর এলাকা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে; যারা শুধু ইজারা দিয়ে এখান থেকে রাজস্ব আহরণ করে। তিনি আরও বলেন, হাওরকে ঘিরে একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। হাওর অঞ্চলের ২৯ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। উপদেষ্টা বলেন, কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে অল ওয়েদার সড়ক। পরে জানা যায় যে, সব ঋতুতেই এই সড়ক সহনশীল। অথচ এই রাস্তা তৈরির মাধ্যমে এরইমধ্যে ঐ এলাকার নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, মাছ ধরার জন্য এরইমধ্যে আমরা কারেন্ট জাল বন্ধ করেছি। কিন্তু বর্তমানে চায়নাদুয়ারী নামক জালে মাছ ধরা হচ্ছে। এগুলো অবশ্যই বন্ধ করা হবে। জাল হবে মৎস্যজীবীদের একটা উপকরণ অথচ এই জাল হয়ে গেছে এক অবৈধ জাল। প্রকৃত জেলেরা এসব অবৈধ জাল ব্যবহার করে না। কিছু মৌসুমী মৎস্যজীবীরা এসব জাল ব্যবহার করা থাকে বলে মন্তব্য করেন তিনি। উপদেষ্টা হাওর রক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন এলাকাকে অভয়াশ্রম ঘোষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বিলুপ্ত হওয়া মাছগুলো ফিরে আসতে পারে। সুতরাং জৈবিক ব্যবস্থাপনা হবে হাওর রক্ষার একটা মূল পদক্ষেপ। হাওরে অঞ্চলের ভুক্তভোগীরা বলেন, হাওরের বিল ইজারা প্রায় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রভাবশালী মহাজনদের হাতেই যায়; যার ফলে সাধারণ মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত হয়। মৎস্যজীবী সমিতির নামে হাওর ইজারা নেওয়ার ক্ষেত্রেও নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের সমর্থকরা হাওর লিজ নিয়ে থাকে। তাই হাওর বিল লিজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত সাধারণ মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীরা পেতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা। ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)-এর আহ্বায়ক রাশেদা কে. চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সাবেক সচিব ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। এতে আরও বক্তৃতা করেন বারসিকের পরিচালক পাভেল পার্থ, হাওর সংস্কৃতি অধ্যয়ন এবং গবেষণা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সজল কান্তি সরকার, মানবাধিকার কর্মী জাকিয়া শিশির, হাওর উন্নয়ন আন্দোলনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম মোখলেসুর রহমান। এ সময় হাওর অঞ্চলের ভুক্তভোগী আহ্লাদ খান, অঞ্জনা বিশ্বাস, বোরহান উদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর সদস্য সচিব শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় হাওর অঞ্চলে বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপস্থাপনা করেন অ্যাসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এআইআরডি)-এর পরিচালক আব্দুল হাই চৌধুরী। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

বিএফআরআই-এর গবেষণায় কার্পজাতীয় মাছের পঞ্চম নতুন প্রজনন কেন্দ্র আবিষ্কার

দেশে মিঠা পানিতে দেশীয় মাছের প্রজননের আধার পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত কৃত্রিম মিঠা পানির হ্রদ কাপ্তাই হ্রদ। ১৯৫৬ সালে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ নির্মাণের সময় ৫৬ হাজার কৃষি জমি প্লাবিত হয়ে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এই হ্রদ শুধুমাত্র মিঠাপানির মাছের আধার নয় বরং প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) বিজ্ঞানীরা কাপ্তাই লেকে কার্পজাতীয় মাছের ৫ম নতুন প্রজনন কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছেন। লংগদু উপজেলার কাসালং চ্যানেলের মালাদ্বীপ মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে ওই প্রজনন কেন্দ্র চিহ্নিত হয়। এর আগে ওই হ্রদে কার্পজাতীয় মাছের চারটি প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র আবিষ্কার করা হয়েছিল। সেগুলো হলো কাসালং চ্যানেলে মাইনীমুখ মাস্তানের টিলা সংলগ্ন এলাকা, কর্ণফুলী চ্যানেলে জগন্নাথছড়ি এলাকা, চেংগী চ্যানেলের নানিয়ারচর এলাকা ও রিংকন চ্যানেলের বিলাইছড়ি এলাকা। সোমবার (১২ মে ২০২৫) এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাবলিকেশন অফিসার, এস. এম. শরীফুল ইসলাম। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার ও বি. এম. শাহিনুর রহমান। দলে আরও ছিলেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. খালেদ রহমান ও মো. লিপন মিয়া। বিএফআরআই-এর রাঙামাটিস্থ নদী উপকেন্দ্র বিগত কয়েক বছর ধরে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন, সংরক্ষণ, কার্পজাতীয় মাছের পরিপক্কতা ও প্রাকৃতিক প্রজনন নিরূপণ এবং রেণু সংগ্রহ ও প্রজাতি বিন্যাস বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গবেষণার অংশ হিসেবে এবার চিহ্নিত হয়েছে নতুন এ প্রজনন কেন্দ্রটি। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন ছিল ১৭ হাজার ৫৬ মেট্রিক টন, যা প্রায় ২৬ হাজার ৬৮৮ জন মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবারের জীবিকার অন্যতম প্রধান ভরসা। চলতি ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে তারা পূর্বের স্থান থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উজানে গিয়ে মালাদ্বীপ মসজিদসংলগ্ন এলাকায় নতুন প্রজনন কেন্দ্রটি শনাক্ত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সংগ্রহকৃত ডিম থেকে রেণু উৎপাদনের হার ছিল প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। গবেষণায় হ্রদের কাসালং চ্যানেলে চলতি বছরের প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) পানির গভীরতা ছিল মাত্র ১.৮ থেকে ২.৪ মিটার। তাছাড়া পানির অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি যেমন দ্রবীভূত অক্সিজেন (৫.২-৬.৬ মিগ্রা./লি.), লবণাক্ততা (০.০১-০.০২ পিপিএম), পিএইচ (৭.২৮-৭.৪০) এবং পানির তাপমাত্রা (২৬.৬২-২৭.১ ডিগ্রি সে.) অনুকূল থাকায় কার্পজাতীয় মা মাছ ডিম ছেড়েছে। (সূত্র : দৈনিক ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস, ১২ মে ২০২৫)

৪টি দিয়ে শুরু এখন ২৬টি গরুর মালিক

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার অরন্যপুর গ্রামের মোহাম্মদ মোস্তফা ২০০৫ সালে পারিবারিক পরিসরে মাত্র চারটি গরু নিয়ে খামার শুরু করেছিলেন, সময়ের পরিক্রমায় এখন ২৬টি গরুর মালিক তিনি। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি একদিন সেই খামার রূপ নেবে একটি পূর্ণাঙ্গ খামারে। আজ তাঁর (মোস্তফা অ্যাগ্রো) ফার্মে রয়েছে নেপালি, শাহীওয়াল, শংকর ও দেশি জাতের নানান গরু। খামার পরিচর্যার জন্য মাসিক ১৮ হাজার টাকা বেতনের একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারীও রেখেছেন তিনি। খামারটি কেবল তার পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই মজবুত করেনি, পাশাপাশি কর্মসংস্থানও তৈরি করেছে। ছয় সদস্যের পরিবারে স্ত্রী, তিন মেয়ে ও দুই ছেলে সবারই এই খামার নিয়ে গর্বের শেষ নেই। গরু গুলোর সুষম খাদ্যের জন্য ভুট্টা, চাউলের খুদ, ভুসি, সয়াবিনও খড়ের পাশাপাশি নিজ জমিতে উৎপাদিত কাঁচা ঘাসও প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখেন।

মাঝেমধ্যে বাজার থেকে কোম্পানির ফিডও ক্রয় করে থাকেন। তবে এই দীর্ঘ পথচলায় কিছু চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে। গরুগুলোর মাঝে একাধিকবার ক্ষুরা রোগ ও গ্যাসের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যথাসময়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় খামারটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মোস্তফা বলেন, "ইচ্ছে আছে, খামারটা আরও বড় করবো। ঈদের সময় গরুগুলোর ভালো দাম পাই, বিশেষ করে কোরবানির হাটে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করি। কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে তিনি প্রতি বছর তার খামারের গরু বিক্রি করে থাকেন। যেমন পরিবারে বাড়তি আয় হয়, তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে তাঁর খামারের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, কুমিল্লা থেকে খামারটি পরিদর্শন করা হয় এবং খামারিকে প্রয়োজনে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়। পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন মুদ্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হয়; যাতে তিনি খামার পরিচালনার জন্য প্রাথমিক জ্ঞান ও পরামর্শ পেতে পারেন। খামার গড়ে তোলার এই গল্প শুধুই অর্থনৈতিক সাফল্যের নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতার প্রতিচ্ছবি। মোহাম্মদ মোস্তফার মতো খামারিরা আজ দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন। এতে করে প্রাণিসম্পদখাত আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদক: **খালেক হাসান,** কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, আঞ্চলিক অফিস কুমিল্লা।

নারী খামারিদের জন্য প্রকল্প নিচ্ছে সরকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

নারী খামারিদের সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নিচ্ছে সরকার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, গবাদিপশু পালনে যেসব নারী সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন, তাদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা আওতায় আনতে পৃথক প্রকল্প নেওয়া হবে। শুক্রবার (১৬ মে ২০২৫) সকালে রাজশাহী সার্কিট হাউসে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান। ফরিদা আখতার বলেন, "নারী-দের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও উৎসাহিত করতে হলে লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্প দরকার। গবাদিপশু পালনে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এখনও তারা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছেন। তিনি জানান, আসন্ন কোরবানি ঈদ উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি পশুর হাটে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বসানো হবে। এসব ক্লিনিকে ভেটেরিনারি সার্জনরা উপস্থিত থেকে গরু-ছাগলের চিকিৎসা সেবা দেবেন। মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, "গরু-ছাগলের পেছনে যেসব মানুষ থাকেন, তাদের নিরাপদ আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাও আমরা করছি। সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় গরু প্রবেশের বিষয়ে তিনি বলেন, "কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাইরের গরু দেশে ঢোকাতে চাইবে, যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিজিবি ও নৌপুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিল প্রসঙ্গে ফরিদা আখতার বলেন, "প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতে বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণ দুঃখজনক। কৃষিতে যেমন হারে বিদ্যুৎ বিল নেওয়া হয়, এখানেও সেই হার প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এতে ছোট খামারিরা বাঁচবে। তিনি জানান, এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার পাঠানো হয়েছে। (সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ মে ২০২৫)

কুড়িগ্রামে গলদা চিংড়ি চাষে সফলতা

হিমালয়ের পাদদেশীয় দেশের উত্তরের নদ-নদী বেষ্টিত সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রাম। জীবনের প্রয়োজনে এ অঞ্চলের মানুষ প্রত্যন্ত গ্রামের পুকুরে বাংলা বা দেশী নানান জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছে। ফলে মাছ চাষের প্রতি সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পেলে এটি দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার বৈদ্যের বাজার এলাকায় পল্লব চন্দ্র রায়ের ৪০ শতক একটি পুকুরে জেলেরা জাল টানছে। পুকুর পাড়ে জালে ধরা মাছ আনতেই স্থানীয়রা অবাক হয়ে যায় বড় বড় গলদা চিংড়ি দেখে! কিছুটা আশ্চর্য হওয়ার মতোই মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ির চাষ। জেলায় প্রথমবারের মতো কার্প, পাঙাস ও সিলভার র্কাপসহ দেশীয় জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়েছে। কার্প জাতীয় মাছের তুলনায় এ জাতীয় মাছ চাষে অধিক লাভ গুনছেন উদ্যোক্তারা। প্রায় ৭ মাস আগে পিএল সাইজের ৬০০ পিস গলদা চিংড়ি ছাড়া হয় পুকুরে। মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষে সফলতা দেখে খুশি স্থানীয়রাও। অন্যান্য মাছের সাথে চিংড়ি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। এতদিন পুকুরে শুধু কার্প জাতীয় মাছ চাষ হতো। আরডিআরএস বাংলাদেশের সহায়তায় প্রথমবারের মতো দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ করে সফলতা পেয়েছেন মৎস্যচাষিরা। এক খাবারেই পুকুরের সব মাছের খাদ্যের চাহিদাপূরণ এবং উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় আগ্রহী হচ্ছেন মৎস্যচাষিরা। রফতানিযোগ্য গলদা চিংড়ি চাষ এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে মৎস্যচাষিরা লাভবান হবেন এবং কুড়িগ্রাম জেলার অর্থনীতিতে যোগ হবে নতুনমাত্রা। মৎস্যচাষি পল্লব চন্দ্র রায় বলেন, প্রতি কেজিতে ৮/১০টি করে গলদা চিংড়ি উঠছে। বর্তমানে ১২০০ টাকা কেজি বাজার দরে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় করবো বলে আশা করছি। মাছ চাষে মাছের খাবারসহ পুকুর প্রস্তুতকরণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা। সময়মতো খাবার ও সঠিক পরিচর্যা করায় মাছের ওজনও ভালো হয়েছে। এক খরচে বাড়তি দেশীয় মাছ বিক্রি করে আরও লক্ষাধিক টাকা আয় হবে। মাধবী রাণী বলেন, বাজারে গলদা চিংড়ির দাম বেশি। গরিব মানুষের সামর্থ্যের বাইরে এই মাছ। জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে এই মাছ খাওয়া এখন স্বপ্নের মতো। তবে এখন নিজের পুকুরে দেশীয় মাছের সাথে বাড়তি খরচ না করেই গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়েছে। সাইজেও বড়, খেতেও সুস্বাদু। স্থানীয় মৎস্যচাষিরা বলেন, বাংলা বা দেশীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ হয় এটা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু পল্লব রায়ের পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ দেখে আমরা অবাক হয়েছি। আগামীতে আমাদের নিজের পুকুরেও এই মাছ চাষ করবো। রাজারহাট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, "সরকারি-বে-সরকারিভাবে গলদা চিংড়ি চাষে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জেলায় ২৬ হাজারের অধিক পুকুরে সাড়ে ২০ হাজার চাষি মাছ উৎপাদন করছেন। (সুত্র: দৈনিক যায়যায়দিন, ২৮ মে ২০২৫)

ভূরুঙ্গামারীতে চরাঞ্চলের খামার পরিদর্শন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফলভোগীদের খামার পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) দুপুরে উপজেলার শিলখুড়ী ইউনিয়নের উত্তর ছাট গোপালপুর ও তিলাই ইউনিয়নের দক্ষিণ ছাট গোপালপুর গ্রামের গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী প্যাকেজের সুফলভোগীদের খামার পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগি দেয়া হয়েছিল এখন তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছে সুফলভোগীরা। আমাদের প্রকল্প এখানে কাজ করেছে। তিনি আরও বলেন, এ অঞ্চলকে ঘিরে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ উভয় খাতের জন্য আমরা আলাদা প্রকল্প নিব। আমি আশা করছি আগামী মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটি নেয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবো। আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ওখানকার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে যেভাবে প্রকল্প নেয়া দরকার; যা জনমুখী হয় বং বাস্তবায়নযোগ্য হয় আমরা সেভাবেই প্রকল্প নেয়ার চেষ্টা করছি। এ বছর ৫৫ টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প পাশের জন্য সবুজ সংকেতও পেয়েছি। এর আগে সকালে উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ

হলরুমে চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হেমায়েত হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব ইয়ামিন হোসেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. বেগম শামছুন্নাহার আহম্মদ, রংপুর বিভাগীয় পরিচালক ডা. হাই সরকার, প্রকল্প পরিচালক ডা. নন্দ দুলাল টিকাদার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. হাবিবুর রহমান এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও সুফলভোগীরা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০২৫)।

চামড়া সংরক্ষণে বিনামূল্যে ৩০ হাজার টন লবণ দেবে সরকার

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ৩০ হাজার মেট্রিক টন লবণ দেবে অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার (২১ মে) দুপুরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে কোরবানি সম্পর্কিত বিষয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ কমিটির প্রথম সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। মাদ্রাসা-এতিমখানায় ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে জানিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, একটি নির্দেশনামূলক ভিডিও তৈরি করব। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে। আগে সারা দেশে একসঙ্গে কাঁচা চামড়া আসত। চামড়া পঁচে যাবে সে কারণে দাম না পেয়েও বাধ্য হয়ে কম দামে বিক্রি করতে হয়েছে। এবার সেটা হবে না। বশিরউদ্দীন বলেন, প্রধান উপদেষ্টা চান গরিবের হক চামড়ার যেন ন্যায্যমূল্য পায়। এবছর চামড়ার দাম গত বছর থেকে বেশি হবে বলেও জানান তিনি। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বৈঠকে আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নির্ধারিত পশুর হাটের বাইরে পশু কেনা-বেচা যেন না হয়। হাসিল ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছি আমরা। তিনি বলেন, দাম না পেলে আমরা প্রয়োজন হলে সরাসরি কাঁচা চামড়া রপ্তানি করব। এ সময় স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত দাম পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন বশিরউদ্দীন। সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, এবছর সুষ্ঠু বাজার, পরিবহন ও দামে সঠিক বাস্তবায়ন হবে। প্রাণীর প্রতি যেন কোনো নৃশংসতা না হয় এবং কোনো ধরনের ক্ষতিকারক ওষুধ ব্যবহার করে প্রাণীকে মোটাতাজা না করা হয়, সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

এক জোড়া দিয়ে শুরু, এখন ৭শ পাখির এক খামারে সাবলম্বী দম্পতি

শখ করে এক জোড়া পাখি কেনেন জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার সুলতান নগর গ্রামের সালমা সুলতানা ও লোমান রেজা দম্পতি। এখন তাঁদের খামারে আছে ২৫ প্রজাতির প্রায় ৭শ পাখি। এই খামার থেকেই সংসারের অভাব দূর করে হয়েছেন স্বাবলম্বী। গড়ে তুলেছেন গরুর খামার, ফলের বাগান, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ও দুই তলা বাড়ি। খামারে লাভবার্ড, বাজেরিগার, টিয়া, গিরিবাজ, ককটেল, নাইটিঙ্গেল, জেব্রা ফিঞ্চ, কবুতরসহ বর্তমানে আছে ২৫ প্রজাতির পাখি। আগে এই সংখ্যা ছিল ৪০ প্রজাতির এবং প্রায় তিন হাজার পাখি। সালমা ও লোমান বলেন, বেকারত্বে হতাশ হয়ে ২০১২ সালে লোমান বিদেশ পাড়ি জমিয়েছিলেন। চার বছর পর ফিরে এসে শখের বসে এক জোড়া পাখি পালতে শুরু করেন। সেই এক জোড়া পাখি থেকেই গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক খামার। ইউটিউব দেখে শিখেছেন পাখি পালনের কৌশল। মাস শেষে খরচ বাদে আয় হয় প্রায় এক থেকে দুই লাখ টাকা। বর্তমানে খামারে আছে সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকা দামের জোড়া জাপানি বাজেরিগার, ৬০ হাজার টাকার কবুতর এবং সর্বনিম্ন এক হাজার টাকার লাভবার্ড। খামারের আয় দিয়েই দুই তলা বাড়ি করেছেন। বাড়ির পাশে ২২ শতাংশ জমিতে গড়ে তুলেছেন ফলের বাগান। এছাড়া জামালপুর শহরের দিগপাইত এলাকায় দুটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসাতেও যুক্ত হয়েছেন। প্রতিদিন পাখিদের জন্য ৪০ কেজির মতো খাবার লাগে, যার ব্যয় সাড়ে তিন হাজার টাকা। খাবার আসে জামালপুর, টাঙ্গাইলের মধুপুর ও রংপুর থেকে। তিনি পাখি বিক্রি করেন অনলাইনে ও খামার থেকেই। সারা দেশেই তাঁর ক্রেতা আছে। সালমা সুলতানা বলেন, 'পথটা সহজ ছিল না। পরিশ্রম ও সততা আমাদের ভাগ্যবদল করেছে। আজকের এই অবস্থানে পৌঁছাতে অনেক ঝড় এসেছে। কিন্তু আমরা পরিশ্রম করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এখনো আমরা দুজনেই খামারের সব কাজ করি। পরিশ্রম করলে যেকোনো কাজে সফলতা আসবেই।' (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মে ২০২৫)

গরু মোটাতাজাকরণ উদ্যোগ
রাজশাহীর গ্রামবাসীদের ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে

ঈদ-উল-আযহাকে সামনে রেখে গ্রামবাসীরা কাঙ্ক্ষিত লাভ অর্জন করায়, বিগত বছরের মতো এবারও এই অঞ্চলে গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দশক ধরে পশুসম্পদ সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে, গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে ঘরে ঘরে এই ধরনের গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম ব্যাপক অবদান রাখছে। স্থানীয় চাহিদাপূরণের পর এই ব্যবসা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু সরবরাহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে। তাছাড়া, দেশীয় গবাদি পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি এই অঞ্চলকে গবাদি পশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছে। গত কয়েক বছর ধরে, বেশিরভাগ পশুর হাটে ক্রেতাদের দেশীয় পশু কিনতে দেখা গেছে। নারীসহ কিছু দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এই খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় পশু পালন খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জনের পর বর্তমানে, গরুর বাজারে রেকর্ড পরিমাণ গৃহপালিত পশুর সরবরাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে, গত কয়েক বছর ধরে, অনেক গ্রামবাসীকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে তাদের ষাঁড় মোটাতাজাকরণ করতে দেখা গেছে। তারা স্টেরয়েড ট্যাবলেট বা ইনজেকশনের পরিবর্তে এখন খড়, গুড়, খইল, ছোলা, কালো ছোলা, সবুজ ঘাস ও গমের ভুসি ব্যবহার করে। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার হালিদাগাছি গ্রামে তার আধা-পাকা বাড়িতে ৪৫ বছর বয়সী মাবিয়া খাতুন বলেন, 'আমি নিজে নিজে খড়, ঘাস ও অন্যান্য গরুর খাবার তৈরি করি। তার প্রতিবেশী আবদুস সাত্তার (৫৩) তার ব্যবসার সাফল্যের গল্প বর্ণনা করেন। তিনি জানান, এলাকার কমপক্ষে ৪৩টি পরিবার লাভজনক কোরবানির গরুর বাজার ধরার জন্য ষাঁড়সহ গরু মোটাতাজা করছে। জেলার দুর্গাপুর ও পুঠিয়া উপজেলায় ২৫০টিরও বেশি গরু মোটাতাজাকরণ খামার রয়েছে। এই খামারগুলোতে কৃষকরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে প্রায় ১০ হাজার ষাঁড় মোটাতাজাকরণ করছেন। এর পাশাপাশি, গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ২৫ হাজারেরও বেশি ছাগল পালন করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা ও প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জালাল উদ্দিন সর্দার বলেন, রাজশাহীতে গরু মোটাতাজাকরণের উদ্যোগ সফল প্রমাণিত হয়েছে; যা গ্রামীণ জীবিকা ও স্থানীয় অর্থনীতিতে উন্নতি সাধন করেছে। প্রান্তিক পুরুষ ও নারীসহ অনেক কৃষক এটিকে একটি লাভজনক ও টেকসই আয়ের উৎসে পরিণত করেছে। প্রাণিসম্পদ বিভাগের মতো সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে এটি সহজতর হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন করেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মো. তোফাজ্জেল হোসেন গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ একাডেমির গভর্নিং বডির ৮ম সভায় যোগদান উপলক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে আগমন করেন। সচিব মহোদয়ের আগমন উপলক্ষ্যে একাডেমির রীতি অনুযায়ী একাডেমির ক্যাডেটগণ তাঁকে সম্মানী সালাম প্রদান করেন অতঃপর তিনি ক্যাডেটদের প্যারেড পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে সচিব মহোদয় গভর্নিং বডির সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভার সমাপনান্তে তিনি মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি একাডেমির ফিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রকারের জীববৈচিত্র্য অবলোকন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। একাডেমির অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন যে, একাডেমির ফিশ মিউজিয়াম বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা আছে এবং প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীরা ফিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করার মাধ্যমে সামুদ্রিক জীবজগৎ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করে। এছাড়াও, সচিব একাডেমির ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থাপনাসমূহ পরিদর্শনের পর সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন শেষে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিকে বিশ্বমানের মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব মেরিন ফিশারিজ একাডেমির সার্বিক উন্নয়নে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে একাডেমি কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেন। (সূত্র : এগ্রি২৪.টিভি, ১ মে ২০২৫)

বর্ষাকালে মাছ চাষে করণীয়

বর্ষাকালে নদী খাল বিল থই থই থাকে পানিতে। মাছ চাষের জলাশয় বা পুকুর থাকে পানিতে পরিপূর্ণ। মাছের প্রাকৃতিক আধার হিসেবে বিল ও ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। বর্ষা মৌসুমে প্লাবনভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রজনন করে তাদের বংশধ-রা বজায় রাখে এবং নার্সারি ও বিচরণক্ষেত্র হিসেবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার বর্ষা মৌসুমে বিলের নিকটবর্তী ফসলের জমিগুলো যখন পানির নিচে প্লাবিত হয়, তখন অধিকাংশ স্থানেই এগুলো হয়ে যায় অব্যবহৃত সম্পদ। সামান্য কিছু সংস্কারের মাধ্যমে এসব মাঠের বর্ষার পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে মাছচাষ করা সম্ভব। প্লাবনভূমির একই মাঠে অনেক কৃষকের ফসলের জমি থাকে বিধায় এখানে প্রয়োজন সবার সম্মতি, ঐক্যবদ্ধতা। প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়-নের মাধ্যমে জনগণ যে শুধু অর্থনৈতিকভাবেই লাভবান হয় তা নয়, বরং এলাকাজুড়ে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ও হয়।

বর্ষা মৌসুমে মাছ চাষে সতর্কতা: বৃষ্টির পানি কিছুটা অম্লীয়, তাই পুকুরে পানির পিএইচ মান কমে যেতে পারে। সেজন্য বৃষ্টির পর পানির পিএইচ পরীক্ষা করে প্রয়োজনমতো পাথুরে চুন পরিমাণমতো পানিতে গুলে ঠান্ডা করে প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টির পানি কিছুটা ঠান্ডা হওয়ায় অতি বৃষ্টিতে পুকুরে পানির তাপমাত্রা এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। যদি কোনো কারণে পুকুরে অক্সিজেন সংকট দেখা দেয় তবে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা দূর করার জন্য প্যাডেল হুইল এরেটর, ডাবল স্পিড এরেটর, পুশ ওয়েব এরেটর ও কুলিং এরেটর ইত্যাদি যা পুকুরে স্থাপন করে কার্যকরভাবে এই সমস্যা দূর করা যায়। কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহে জিওলাইট বালুর সাথে মিশিয়ে পুকুরের সর্বত্র প্রয়োগ করে অক্সিজেন স্বল্পতার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বর্ষা মৌসুমে মাছ চাষের পুকুরগুলো বৃষ্টির পানিতে ভরে যেতে পারে। তাই মাছ চাষের পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি ঢুকানোর পথের ছাঁকনিটি দু'স্তর বিশিষ্ট হতে হবে। এর প্রথমটির ফাঁস ১.৫ মিমি এবং দ্বিতীয়টির ফাঁস ০.৫ মিমি। পানি বের হওয়ার পথে একটি ছাঁকনি থাকলেই চলে। এ জালের ফাঁস হবে ১.৫ মিমি। ছাঁকনির বাইরে একটি নিরাপত্তা বানার ব্যবস্থা রাখলে মূল ছাঁকনিটির কার্যক্ষমতা বাড়বে। প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বদল করার সুবিধা কাজে লাগানো যায়। পুকুরের পানি নিয়মিত পরীক্ষা ও খেয়াল রাখতে হবে। মাছ চাষের জন্য তাপমাত্রা ২৮-৩১ ডিগ্রি সে., দ্রবীভূত অক্সিজেন কমপক্ষে ৫ পিপিএম বা মিলিগ্রাম/লিটার, কার্বন ডাই-অক্সাইড ১২ মিলিগ্রাম/লিটার এর নিচে, অ্যামোনিয়া ০.০২৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর নিচে, পিএইচ ৭.৫-৮.৫, ক্ষারত্ব ৪০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার, ঘোলাত্ব ২০০০০ মিলিগ্রাম/লিটার এর নিচে, স্বচ্ছতা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার। পুকুরে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য দিতে হবে। তবে বৃষ্টির দিনে মাছ চাষের পুকুরে সার ও খাদ্য দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে মাছের রোগবালাই তুলনামূলক কম হয়। মাছ চাষে প্রতি মাসে প্রতি শতকে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি হারে (পানির পিএইচ পরীক্ষা করে) পাথুরে চুন পরিমাণমতো পানিতে গুলে ঠান্ডা করে প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগ করলে মাটি ও পানির অম্লতা প্রশমিত করে; সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি; ক্ষতিকর গ্যাস ও রোগজীবাণু দূর করে; চুনের ক্যালসিয়াম গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান; প্লাঙ্কটন বৃদ্ধির জন্য কাদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে; পানির ঘোলাত্ব দূর হয়। মাছচাষের পুকুরে পরিমাণমতো চুন পানিতে গুলে ঠান্ডা করে পুকুরের সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। মাটি ও পানির পিএইচ পরিমাপ করে সাধারণ প্রয়োগমাত্রা ০.৫-১ কেজি/শতক হারে চুনের পাশাপাশি জিওলাইট ব্যবহার করতে হবে। বর্ষার ভরা মৌসুমে অবিরাম বৃষ্টি বা আকস্মিক বন্যার পানিতে পাড় ডুবে মাছ ভেসে যেতে পারে। আবার বৃষ্টির সময় পুকুরে যাতে বাইরের ময়লা পানি গড়িয়ে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সময় পুকুরের পাড় উঁচু করে দিতে হবে। পুকুর পাড় এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে পানি বৃদ্ধির কারণে পুকুর থেকে কোন মাছ বের হয়ে যেতে না পারে। অতি বৃষ্টিতে/বন্যার সময় পুকুরে মাছ আটকানোর জন্য পুকুর পাড়ের চারদিকে মশারির নেট বা জাল, বাঁশের বানা দিয়ে ঘের/বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের কোণায় ও মাঝখানে ঝোপঝাড় দিয়ে মাছের আশ্রয়স্থল বানাতে হবে। মাছ দ্রুত আকৃষ্ট হয় এমন খাবার যেমন সরিষার খৈল, চিটাগুড় পুকুরে দুই বা তিন স্থানে দিয়ে রাখা যেতে পারে। পুকুর পাড়ে/পুকুরের কাছাকাছি বড় গাছ থাকলে গাছের কাণ্ড কেটে ফেলতে হবে। পুকুরে ডাল বা পাতা পড়া উচিত নয়। বর্ষায় ডুবে যাওয়া পুকুর বা জলাশয়ে বর্ষা পরবর্তী পোনার চাহিদা মেটানোর জন্য খাঁচায় পোনা মজুদ করা যেতে পারে। মাছ চাষে লাভবান হওয়ার জন্য পুরো বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মাছ চাষের যে কোনো পরামর্শের জন্য উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ১৬১২৬ এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে অথবা মৎস্য পরামর্শ সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপ 'Dr. Fish (মাছের ডাক্তার)' থেকে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

লেখক: **মো. লতিফুর রহমান সুজন,** সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

**"বর্ষাকালে মাছের যত্ন
মিলবে আমিষ, পুষ্টি ও রত্ন"**

এ বছর ঈদ-উল-আযহায়
৯১ লাখের বেশি পশু কোরবানি হয়েছে

ঈদ-উল-আযহা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এবারের ঈদ-উল আযহায় সারা দেশে বিপুলসংখ্যক পশু কোরবানি করা হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশে ঈদ-উল আযহায় ৯১ লাখের বেশি পশু কোরবানি করা হয়। এর মধ্যে গরু ও ছাগলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সরকারি সংস্থা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, ২০২৫ সালে দেশে ৯১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৩৪টি পশু কোরবানি হয়েছে। যার মধ্যে গরু/মহিষ ৪৭ লাখ ৫ হাজার ১০৬টি; ছাগল/ভেড়া ৪৪ লাখ ৩০ হাজার ৬৬৮ টি; অন্যান্য ৯৬০টি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মূলত পশু কোরবানির হিসাব করে থাকে। অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাদের তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবটি করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এবার কোরবানির পশু অবিক্রীত ছিল ৩৩ লাখ ১০ হাজার ৬০৩টি। (সূত্র : **মো. মামুন হাসান,** সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

“সঠিক উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ করি নিরাপদ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করি”

সম্মানিত লেখকদের প্রতি আহবান:

প্রিয় সুহৃদ!

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর হতে “আমিষ বার্তা” নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সৃজনশীল এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগত। আমাদের ম্যাগাজিনের আসন্ন চতুর্থ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। আপনি যদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সফলতার গল্প, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে যুক্ত হোন।

- ★ লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫
- ★ লেখার পরিমাণ: সর্বোচ্চ ১২০০ ওয়ার্ড (অবশ্যই সুতনী ফন্টে)
- ★ লেখার সঙ্গে লেখক এর পূর্ণ পরিচয় ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সফট কপি)
- ★ ই-মেইল/যোগাযোগ: flidmofl@gmail.com
  ০১৭১৭৬০৮৬২২ (whatsapp)

✷ **আপনার লেখাই হতে পারে আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।**